উৎসর্গপত্র।

ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু।

ভ্রাতঃ!

তুমি দীর্ঘকাল বিলাতে থাকিয়া অশেষ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া আজ সার্দ্ধ ষট্ বৎসর পরে বাটী আসিয়াছ। এতদিন আমরা তোমার বিরহে অধীর হইয়াছিলাম। অনেক দিনের পর তোমাকে পাইয়া আজ আমাদের আনন্দের আর সীমা নাই। কি দিয়া আর তোমার অভ্যর্থনা করিব? আমার আছে কি? কিছু নাই বলিয়াই আমি আর্য্যদর্শন-উদ্যান হইতে গুটিকত সমালোচনা-কুসুম তুলিয়া এই মালা গাঁথিয়াছি। এই 'সমালোচনা-মালা' আজ মনের উল্লাসে ও হৃদয়ের প্রীতিতে তোমার করে অর্পণ করিলাম। অপরের নিকট অনুপাদেয় হইলেও, আশা করি--এই ভ্রাতৃ-দত্ত 'সমালোচনা-মালা' তোমাকর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে। এই মালা দিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করি—যেন তুমি যে দুর্ল্লভ জ্ঞানরাশি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছ, তাহা দ্বারা নিজের, পারিবারিক ও জাতীয় মঙ্গল সাধনে সতত নিরত থাক। ইহা অপেক্ষা আশীর্ব্বাদের বড় বিষয় আর দেখি না!

ময়মনসিংহ

২০ এ ভাদ্র ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

কারণ প্রণয়বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা তাঁহাদিগের লক্ষ্য। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর লক্ষ্য ভোগলালসার মূলে কুঠারাঘাত করা; প্রণয়বৃত্তির মূলে নহে। বঙ্কিম বাবু জানেন যে প্রণয় মানুষকে দেবতা করে, আত্মবিস্মৃত করে, পরসুখে আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখায়; প্রণয় যত পরিপুষ্ট হইবে, ততই জগতের মঙ্গল; ভোগলালসাই মানুষের যত অনিষ্টের মূল; ভোগলালসা হইতেই তাঁহার "বিষবৃক্ষের" সৃষ্টি। সুতরাং ভোগলালসার সংযমন করিতে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার আখ্যায়িকা সকলের নৈতিক উদ্দেশ্য। বিষবৃক্ষে এই নৈতিক লক্ষ্য বিশেষরূপে প্রতিভাত। নগেন্দ্রের ভোগলালসা দমন করার শিক্ষার অভাবই বিষবৃক্ষের অঙ্কুর।

বঙ্কিম বাবু যে কয়খানি আখ্যায়িকা রচনা করিয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল ও বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে "বিষবৃক্ষ" আমাদিগের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভাবের গভীরতায় ও রচনার শিল্প-পারিপাট্যে ইহা বঙ্গভাষায় প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত।

এই চিত্রপটে ছয়টী ছবি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। দুইটী পুরুষের—নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্রের; চারিটী স্ত্রীলোকের সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি ও হীরার। শ্রীশ এ পুষ্পস্তবকের নবীন পল্লবমাত্র। আমরা এই প্রকাণ্ড গ্রুপ্ হইতে এক একটী করিয়া কয়টী ছবির স্বতন্ত্র ফটোগ্রাফ তুলিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া পাঠকদিগকে পরিতৃপ্ত করিব।

নগেন্দ্রনাথ।

নগেন্দ্রনাথ দত্ত গোবিন্দপুরের বিপুল-ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার। যে সময়ে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়, সে সময় নগেন্দ্রের বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র। প্রকৃতি নগেন্দ্রনাথকে অশেষ সুখের অধিকারী করিয়াছিলেন। অনুপম কান্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য, সুস্থ শরীর, সর্ব্বশাস্ত্রাবগাহিনী বিদ্যা, শান্ত ও বিনীত চরিত্র, পতিপ্রাণা প্রেমময়ী ভার্য্যা—এ সমস্তই তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। নগেন্দ্রের বিমল ও উদার চরিত্রগুণে

নগেন্দ্র আশৈশব নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি সত্যবাদী অথচ প্রিয়ভাষী, পরোপকারী অথচ ন্যায়পরায়ণ, দানশীল অথচ মিতব্যয়ী, স্নেহশীল অথচ কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত, ভার্য্যানুরক্ত, শত্রুমিত্রসমদর্শী, আশ্রিতপ্রতিপালক, বন্ধুর হিতকারী এবং ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান্ ছিলেন। তিনি পরামর্শে বিচক্ষণ, কার্য্যে উদ্যমশীল, আলাপে বিনয়ী এবং রহস্যে বাক্‌পটু ছিলেন। এরূপ নির্ম্মল ও উদার চরিত্রের পরিণাম—নিরবচ্ছিন্ন বিমল সুখ। নগেন্দ্রও আশৈশব তাহার অধিকারী ছিলেন।

নগেন্দ্রের জীবন-স্রোতে এতদিন কোন তরঙ্গ উঠে নাই। যে ঘাত-প্রতিঘাতে মনুষ্য-জীবনের ভীষণ বিবর্ত্ত উত্থিত হয়, নগেন্দ্রের জীবনে এতদিন তাহা ঘটে নাই। যাহা বাঞ্ছনীয়, নগেন্দ্রের সমস্তই ছিল—দেশে সম্ভ্রম, বিদেশে যশ; ভার্য্যার অবিচলিত, অপরিমিত ও অকলুষিত প্রেমরাশি; দাস দাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা; প্রজাগণের প্রগাঢ় ভক্তি; এবং বিপুল-ঐশ্বর্য্য-জনিত ভোগরাশি—নগেন্দ্র এক সময়ে এ সমস্তই ভোগ করিতেছিলেন। অভাব কি এবং তজ্জনিত দুঃখ কি, নগেন্দ্র এতদিন তাহা জানিতে পারেন নাই। অভাবজনিত দুঃখ দূর করণের ইচ্ছাই লালসা। নগেন্দ্রের এতদিন কোন অভাব ছিল না, সুতরাং তজ্জনিত দুঃখ, এবং সেই দুঃখ দূর করণের লালসাও জন্মে নাই। এতদিনে সেই অভাব দেখা দিল। বয়স সহকারে সূর্য্যমুখীর রূপের হ্রাস হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখীতে এতদিন নগেন্দ্রের রূপতৃষ্ণা ও প্রেমতৃষ্ণা উভয়ই নিবারিত হইতেছিল; কিন্তু রূপতৃষ্ণা এখন আর সম্পূর্ণ নিবারিত হইল না। এতদিনে নগেন্দ্র অন্তরে কিঞ্চিৎ অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র বিষবৃক্ষের বীজধারণক্ষম হইল। ক্ষেত্র কৃষ্ট হইল, এক্ষণে বীজের অপ্রতুল। তাহাও শীঘ্র সংযোজিত হইল।

নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে কলিকাতায় আনিয়া যখন তাহার মাতৃ-স্বসৃপতির বাটীর অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন নিরাশ্রয়া আশ্রিতা বালিকার প্রতি তাঁহার মমতা জন্মিল। কুন্দের রূপ

রূপে তাঁহার রুষ্ট হৃদয়-ক্ষেত্রে পতিত হইল। বীজ যে উপ্ত হইল, হার প্রিয়বন্ধু হরদেব ঘোষালকে তিনি যে পত্র লিখেন, তাহাতে রব্যক্ত আছে। পত্রখানি এই ;—

"বল দেখি কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী ? তুমি বলিবে চল্লিশ র, কেন না তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম, তাহার বয়স তের বৎসর। হাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবন াবের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে চ থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। জিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে, আবার রণ করিলেই ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখা া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখা পড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। ন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে, বৃহৎ, নীল, চক্ষু দুইটী— াতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটী চক্ষু ামার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না, ামি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। ন আমার মতিস্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি তিকের গুণে গাছ কয় চুল পাকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা সিল করিয়াছ ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুইটী-চক্ষের সম্মুখে দাঁড় রাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটী কিরূপ, তাহা আমি এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুই-র একরকম দেখিলাম না ; আমার বোধ হয় যেন, এ পৃথিবীর চোখ্ নয় ; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না, অন্ত-ক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ ন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব পেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী খন দেখি নাই। বোধ হয় যেন, কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী-ছাড়া কিছু াছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয় ; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে

শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটী, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তভাব ব্যক্তি—যদি স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে ভাব ব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।"

অলৌকিক সুশীলতা ও সরলতার প্রতিবিম্ব কুন্দনন্দিনীর রূপ যেরূপ রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহার ঘাত প্রতিহত করা নগেন্দ্রের অসাধ্য হইল। নগেন্দ্র নিভৃতে ও সযত্নে সে রূপ হৃদয়ে পোষিত করিলেন। সূর্য্যমুখীর অনুরোধানুসারে কুন্দকে বাটী আনিলেন; তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ দিলেন। তিন বৎসরের মধ্যেই কুন্দ বিধবা হইলেন। বিধবা কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহে আবার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এতদিন নগেন্দ্রের কুন্দ-লালসা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অদৃশ্য ও অভিভূত ছিল। আবার তাহা ক্রমে ক্রমে সন্ধুক্ষিত হইতে লাগিল। যে বীজ নগেন্দ্র এতদিন সযত্নে লালিত করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা এতদিনে অঙ্কুররূপে পরিণত হইল। কুন্দলালসা নগেন্দ্রের মনে ক্রমেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কুন্দের বয়স এখন ১৭।১৮; কুন্দের রূপলাবণ্যে এখন জগৎ আলোকিত হইয়াছে—নগেন্দ্রের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছে। অভাবের পরিপূরণ না হইলে যে দুঃখ—নগেন্দ্র এখন তাহা অনুভব করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র এ দুঃখের পরিহার জন্য চিত্ত-সংযমনে প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তসংযমনের চেষ্টা সূর্য্যমুখীর পত্রে অতি সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে:——"আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরাণ না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভৎর্সনাও করিতে শুনিয়াছি"। নগেন্দ্র এইরূপে কুন্দলালসা উন্মূলিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। সূর্য্যমুখী তাঁহার প্রত্যেক স্বভাব লক্ষ্য

করিতে লাগিলেন। কখন কখন কুন্দের জন্য অন্যমনে নগেন্দ্রের চক্ষু এদিক্ ওদিক্ চাহে; সূর্য্যমুখীকে দেখিলে নগেন্দ্র অমনি চক্ষু ফিরাইয়া লন; কুন্দের কণ্ঠধ্বনি শুনিবার জন্য নগেন্দ্র হাতের গ্রাস হাতে করিয়া কাণ তুলিয়া থাকেন; হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কাণ তুলিয়া থাকেন, আবার কুন্দের স্বর কাণে গেলেই বড় জোরে হাপুস হুপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন; এবং অন্যমনস্ক হইয়া সকল কথাতেই "হুঁ" দেন। নগেন্দ্রের এই দুর্দ্দশাগ্রস্তা সূর্য্যমুখীর নিকট অবিদিত রহিল না। কুন্দের বৈধব্য ও অনাথিনীত্ব অন্যের মুখে শুনিলে নগেন্দ্রের কষ্ট হইত। তিনি তথা হইতে বেগে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার মধ্যে মধ্যে গোত্রস্খলন হইত। কুমুদ নামে একজন দাসীকে ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলিতেন। আর সর্ব্বদাই অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হইতেন। ক্রমে নগেন্দ্রের কুন্দতৃষ্ণা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি কুন্দকে বিবাহ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত আসিলে তাঁহাদিগের সহিত বিদ্যাসাগর-মহাশয়-প্রণীত বিধবাবিবাহ বিচার নামক পুস্তক লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেন। যাঁহারা বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা স্বীকার করিতেন, তাঁহাদিগকে সবিশেষ পুরস্কৃত করিতে লাগিলেন। কুন্দময়-জীবিত নগেন্দ্র ক্রমে পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখীর অনাদর আরম্ভ করিলেন।

চিত্তসংযমে অক্ষম হইয়া নগেন্দ্র কুন্দস্মৃতি-বিলোপের জন্য আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি মদ্যপ হইলেন। ভাবিলেন, মদ্যে তিনি কুন্দকে ভুলিবেন। যদি তাহা নিতান্ত অসাধ্য হয়, মদ্যপ হইয়া অন্ততঃ তিনি তাঁহার প্রতি সূর্য্যমুখীর অবিচলিত ভক্তি টলাইবেন। তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহার হৃদয়ের যাতনা অনেক কমিবে। কিন্তু তিনি এই দুই লক্ষ্যেই অকৃতকার্য্য হইলেন। মদ্যে কুন্দস্মৃতিরও বিলোপ সাধন হইল না, সূর্য্যমুখীরও ভক্তি টলিল না। ঘাত-প্রতিঘাতে নগেন্দ্রের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। নগেন্দ্র ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। নগেন্দ্রের বিষয় যায়, আর থাকে না। একদিন সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের দুইটী চরণে হাত দিয়া কষ্টে অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া

অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নগেন্দ্রকে বলিলেন "কেবল আমার অনুরোধে, ইহা ত্যাগ কর"। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "দোষ কি? সূর্য্যমুখী বলিলেন "দোষ কি, তাহাত আমি জানি না: কেবল আমার অনুরোধ"। নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন "সূর্য্যমুখি! আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্য করে না"। একদিন তিনচারি হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় করযোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই হুজুর—নায়েব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে?" যে নগেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে একজন গোমস্তা একজন প্রজাকে মারিয়া একটী টাকা লইয়াছিল বলিয়া তাহার বেতন হইতে দশটী টাকা কাটিয়া লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন, সেই প্রজাবৎসল কারুণিক নগেন্দ্র আজ কি না হুকুম দিলেন "স হাঁকায় দেও"। নগেন্দ্র যে উচ্চ চরিত্র হইতে দিন দিন স্খলিত হইতেছিলেন, তাহা তিনি নিজে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হরদেব ঘোষালের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি"।

নগেন্দ্র যখন দেখিলেন যে, মদ্যপানেও কুন্দস্মৃতি বিলুপ্ত হইল না, প্রাণপণে চিত্তসংযমনেও কুন্দলালসা দমিত হইল না, তখন তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া সেই অতৃপ্ত লালসা চরিতার্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্থির করিলেন, কুন্দের নিকট হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া ও বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়া তাহাকে বিবাহে সম্মত করিবেন। এক দিন প্রদোষ কালে, উদ্যান-মধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী আত্ম অদৃষ্ট ভাবিতে ভাবিতে নিরতিশয় কাতর হইয়া দেহ বিসর্জ্জনে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বপ্নদত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ যেমন ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে ধীরে আসিয়া কুন্দের পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ! কাল কলিকাতায় যাইবে?" কুন্দ কোন উত্তর করিল না—চক্ষু মুছিল। নগেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ! ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ?"

আবার চক্ষু মুছিল—কোন উত্তর দিল না। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ!—কাঁদিতেছ কেন?" কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল! নগেন্দ্রের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল। এতদিন নগেন্দ্র যে হৃদয় অতি কঠোর শাসনে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ কুন্দের হৃদয়োচ্ছ্বাসে সেই হৃদয়ের কপাট সহসা উদ্ঘাটিত হইল। নগেন্দ্র অবারিত ভাবে কুন্দকে তথায় প্রবেশ করিতে দিলেন। বলিলেন "শুন কুন্দ! আমি বহুকষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ্যপ হইয়াছি। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন কুন্দ! এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল, বলিল "না"। আবার নগেন্দ্র বলিলেন "কেন কুন্দ! বিধবা-বিবাহ কি অশাস্ত্রীয়?" কুন্দ আবার বলিল "না"। নগেন্দ্র আবার বলিলেন, "তবে না কেন? বল—বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভাল বাসিবে কি না?" কুন্দ পুনরপি বলিল "না।" জ্ঞানবান্ নগেন্দ্র অজ্ঞানা বালিকার নিকট পরাস্ত হইলেন। নগেন্দ্র লজ্জিত হইলেন। তাঁহার কুন্দলালসা এবার পরিতৃপ্ত হইল না; কিন্তু এই প্রতিঘাতে সেই লালসানল নির্ব্বাপিত না হইয়া উদ্দীপিত হইল। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের শ্রদ্ধা বাড়িল—প্রেম খরতর হইল।

ইহার অনতিপরে একটী ঘটনায় নগেন্দ্রের কুন্দ-প্রেম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। হরিদাসী বৈষ্ণবীরূপী দেবেন্দ্রের সহিত কুন্দের নির্জ্জনালাপ দেখিয়া একদিন সূর্য্যমুখী কুন্দকে কুলটা সম্ভাবনা করিয়া বিশেষ তিরস্কার করেন। কুন্দ সহিতে না পারিয়া রজনীযোগে নগেন্দ্রের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। নগেন্দ্র শুনিলেন, কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীর তিরস্কারেই দেশত্যাগিনী হইয়াছেন। নগেন্দ্রের মস্তক ঘুরিল। বিষের জ্বালায় তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে

লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছি‍
সূর্য্যমুখী কথাটা প্রথমে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, বলি
"কি বলিয়াছিলাম ?" নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন দুর্ব্বাক
সূর্য্যমুখী তখন আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি কাতরভাবে কু
কলঙ্কসম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন পূ
স্বামীর নিকট আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা
লেন। নগেন্দ্র বলিলেন "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই। তুমি যে
কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্র লোকের স্ত্রী
মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে ? কিন্তু একবার ভাবি
হইত যে, কথাটা সত্য কি না ? তুমি তারাচরণের কোন্ দিনের
খবর না জানিতে ? কুন্দের সঙ্গে যে প্রকারে দেবেন্দ্রের যেরূপ
বৎসরের আলাপ, তাই কোন্ না শুনিয়াছ ? তবে মাতালের
বিশ্বাস করিলে কেন ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন "তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন
ভেছি"। নগেন্দ্র বলিলেন "ভাবিলে না কেন" ? সূর্য্যমুখী উত্তর
লেন, "আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল।" সে ভ্রান্তির মূল যে
সূর্য্যমুখী স্বামীর নিকট ইহা অকপটে স্বীকার করিবেন বলিয়
...ন্দ্রের চরণযুগল দুই হস্তে ধারণ করিয়া অগ্রে ক্ষমা ভিক্ষা কবি
নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি
সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।" সূ
অকপটে তাহা স্বীকার করিয়া আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য গভীর অনু
ব্যক্ত করিলেন। নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, দী
নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সূর্য্যমুখি ! অপরাধ সকলই
তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট
হন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি
আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোম
বলিব ? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত-দমনের চেষ্টা করি নাই
ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি তুমি কখ

তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা, আমার চিত্ত বশ হইল না"। সূর্য্যমুখী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কাতরস্বরে নগেন্দ্রকে বিরত হইতে বলিলেন নগেন্দ্র শুনিলেন না; আবার বলিতে লাগিলেন—"না। তা নয়, সূর্য্যমুখি! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি—কেন না অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আমার সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীর সন্ধান করিয়া আমি দেশ দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয়ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যগতপ্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব না, এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব! নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ"।

এই নিষ্ঠুর বাক্য পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখীর হৃদয়ে কিরূপ শেলসম বাজিবে, তাহা নগেন্দ্র একবার ভাবিয়া দেখিলেন না। তিনি আত্মসংযম করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজ তাঁহার সকলই পণ্ড হইল। আযৌবন সূর্য্যমুখীর সহিত তাঁহার যে প্রেম গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল, সেই প্রেমতরু আজ তিনি স্বহস্তে উন্মূলিত করিলেন। তাঁহার অদ্যকার চিত্তচাঞ্চল্য হইতেই বিষবৃক্ষের ফলোৎপত্তি। তিনি যে কুন্দের জন্য আজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিলেন, তাঁহার অদ্যকার নিষ্ঠুরতা তাহার মৃত্যুর বীজ বপন করিল। তিনি যে সূর্য্যমুখীকে এতদিন প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিয়াছিলেন; তাহার ভবিষ্য অমানুষোচিত যন্ত্রণার আজ তিনি সূত্রপাত করিলেন। তিনি যে অমৃততরু স্বহস্তে জলসিঞ্চন দ্বারা পরিপোষিত করিয়াছিলেন, আজ তাহা স্বয়ং অর্দ্ধচ্ছিন্ন করিলেন। সূর্য্যমুখীর অশেষ যন্ত্রণা ও কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর দায়িত্ব আজ তিনি নিজ মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

নগেন্দ্র মনে করিলেই—কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেই ইহার প্রতিকার করিতে পারিতেন; সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী উ কেই বাঁচাইতে পারিতেন। সূর্য্যমুখী স্বামীর চরণ ধরিয়া বলিলেন, "এক ভিক্ষা"। নগেন্দ্র বলিলেন "কি?।" সূর্য্যমুখী বলিলেন "ত একমাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পা যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না"। নগে মৌনভাবে ব্যক্ত করিলেন তিনি একমাস অপেক্ষা করিতে প্রে এবং অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সূর্য্যমুখী যে দিন সহসা কুন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন, সেই কুন্দকে বলিলেন "কুন্দ! এসো—দিদি এসো! আর আমি তে কিছু বলিব না"। এবার সূর্য্যমুখীর সঙ্কল্প, কুন্দের হস্তে প্রাণপ্র স্বামীকে অর্পণ করিয়া নিজে সন্ন্যাসিনী হইবেন। কমলমণিকে লিখিলেন "তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তা পাওয়া গিয়াছে—শুনিয়া সুখী হইবে—ষষ্ঠীদেবতার পূজা দিও। ছাড়া আরও একটা খোসখবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্ব বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রে আ তবে দোষ কি? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আ জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও। কেন না তোমাকে দেখিতে বড় হইয়াছে"। কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্র এই সংবাদে চমকিত হইে শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া নগেন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিলেন। ন তাহার প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহা এই:—

"ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না। অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ কর নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকি নাই। এ বলার পর, আর বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। বে রাও বোধ হয়, ইহার পর আর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য

কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। "যদি কেহ বলে যে, বিধবা-বিবাহ হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই, যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত; তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপনে রাখিব—আপাততঃ কেহ জানিবে না।

"তুমি এসকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে, ইহা নীতিবিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে একথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজেরা কি অভ্রান্ত! মুসার বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি মুসার বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না, তবে কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বলিব?

"তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন? উত্তর—এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পালনকর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

"যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক, তাহাই নীতি-বিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।

"গৃহে কলহাদির কথা বলিয়া তুমি আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটা যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে,

আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্ত হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি?

"শেষ আপত্তি—সূর্য্যমুখী। স্নেহময়ী পত্নীর সপত্নী-কণ্টক ক কেন? উত্তর—সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়া ছেন—ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি? তবে কোন্ কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয়?"

নগেন্দ্র পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান হইয়াও ভ্রমে পতিত হইলেন। দ্বি বাহ বা বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে যে প্রধান আপত্তি গৃহে কলহাদি- তাহার কথা তিনি তুলিলেন বটে, কিন্তু সে আপত্তি ত খণ্ডন করি লেন না।

আর তিনি ভাবিলেন সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন- কারণ, সূর্য্যমুখীই এবিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। কিন্তু সূর্য্যমুখীর হৃদয় যে এবিবাহের পক্ষপাতী নহে, তাহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিলেন না। নগেন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভ হইতে সূর্য্য মুখীর সহিত একত্র বাস করিয়াও সূর্য্যমুখীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

সূর্য্যমুখী কুন্দের সহিত স্বামীর বিবাহ দিয়া কমলমণিকে আন ইয়া তাঁহার নিকট মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে রজনীযোগে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। নগেন্দ্রের প্রা শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

যে কুন্দের জন্য নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী হেন ভার্য্যাকেও পায় ঠেলিয়া ছিলেন, আজ সূর্য্যমুখী-বিরহে সেই কুন্দও নগেন্দ্রের চক্ষুঃশূল হই লেন।

সূর্য্যমুখীর পলায়নের পর প্রদোষে নগেন্দ্র শয়ন করিয়া আছেন- কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। আর কেহ না, অপর দুই জনেই নীরব। কুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিলে, যেমন ছিল, তেমনই হয়?" "কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে?"

নগেন্দ্র উত্তর করিলেন "ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দ্দাহ হয়—তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল"। কুন্দ এ কথায় মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া নীরবে ব্যজন করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ! কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?" কুন্দ বলিল "না"। নগেন্দ্র কহিলেন "কেবল একটি ছোট্টো "না" বলিয়া আবার চুপ করিলে? তুমি কি আমায় আর ভাল বাস না?" কুন্দ বলিলেন "বাসি বই কি?" নগেন্দ্র কহিলেন '"বাসি বই কি?" এ যে বালক ভুলান কথা। 'কুন্দ! বোধ হয়, তুমি আমায় কখন ভাল বাসিতে না'! কুন্দ বলিলেন "বরাবর বাসি"। নগেন্দ্র—সরলা বালার এই সরল ও স্বল্পবাক্ প্রেমকাহিনীর গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমাকে সূর্য্যমুখী বরাবর ভাল বাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন?—লোহার শিকলই ভাল"। আজিকার মর্ম্মপীড়ায় অনাথিনী কুন্দ মৃত্যুপথে অর্দ্ধেক অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। মৃত্যুদিবসের পূর্ব্বে কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের আর দেখা হয় নাই। আজ কুন্দের সুখের শেষ দিন।

সূর্য্যমুখীর পলায়নে নগেন্দ্রের মনে সূর্য্যমুখীপ্রেম দ্বিগুণতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের যে প্রগাঢ় অনুরাগ দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সে আবরণ অপসারিত হওয়ায়—আজ সেই অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত ঔজ্জ্বল্যের সহিত নগেন্দ্রের মনে প্রতিভাত হইল। সূর্য্য অস্ত গেলেই লোকে বুঝিতে পারে যে, সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু—সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার; আর আজ সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া নগেন্দ্র বুঝিলেন—যে সূর্য্যমুখী বিনা তাঁহার সংসার আঁধার—সূর্য্যমুখীই তাঁহার আঁধার ঘরের একমাত্র দীপ। নগেন্দ্র যে কুন্দকে ভাল বাসেন নাই বা বাসেন না এরূপ নহে, কিন্তু সে ভালবাসা অনেকটা রূপবতীর রূপভোগ-লালসা, প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ প্রেম নহে। "চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ-

প্রস্তুত হই” এ সে ভালবাসা নহে। এ রূপজ মোহমাত্র। সুন্দরী রূপ দর্শনে যে চিত্ত-বিকৃতি উপস্থিত হয়, রূপ-ভোগে শীঘ্রই তাহা তীক্ষ্ণতা অপনীত হয়। ভোগে সেরূপ তৃষ্ণার শীঘ্রই পরিতৃপ্তি জন্মে। নগেন্দ্র আজ পোনর দিন মাত্র কুন্দকে বিবাহ করিয়াছেন এবং পোনর দিনের ভোগেই নগেন্দ্রের কুন্দরূপতৃষ্ণা অনেক পরিমাণে উপশমিত হইয়াছিল। এই জন্যই সূর্য্যমুখীর পলায়নের পর অতি দ্রুতবেগে কুন্দচ্ছায়া নগেন্দ্রের হৃদয়াকাশ হইতে অপসারিত হইল। এ প্রেম গুণজনিত প্রেম হইলে, এত শীঘ্র ইহার পরিতৃপ্তি হইত না। পবনের স্বনের ন্যায় এত শীঘ্র ইহা নগেন্দ্রের চিত্তক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইত না।

গুণজনিত প্রণয় যেমন বহুকালসাধ্য, তেমনই বহুকাল-স্থায়ী। প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ-ফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন,—যে প্রেম ক্রমে এই সোপানাবলী দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করে, তাহাই প্রকৃত প্রণয়; তাহা বহুকাল-সাধ্য হইলেও অনন্তকালস্থায়ী; মধ্যে মধ্যে তাহার বিচ্ছেদ ঘটিলেও, তাহার বিলয় অসম্ভব। সূর্য্যমুখীর সহিত বহুদিনের সহবাসে নগেন্দ্রের সেই প্রেম জন্মিয়াছিল। এই জন্য কিছুদিনের বিচ্ছেদে সেই প্রেমের বিলয় সাধন হইল না। ইহা মেঘোন্মুক্ত শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় আবার অপূর্ব্ব জ্যোতি ধারণ করিল। সেই চন্দ্রের আবির্ভাবে সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া নগেন্দ্র অনুতপ্ত হইলেন। সূর্য্যমুখীর পলায়নের পর নগেন্দ্র প্রিয় বন্ধু হরদেব ঘোষালকে যে পত্র লিখেন, তাহার অক্ষরে অক্ষরে এই অনুতাপ পরিব্যাপ্ত। সে পত্রখানি এই—

“তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা, সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া সূর্য্যমুখীকে হারাইলাম। সূর্য্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের

জ। সকলেই মাটী খোঁড়ে, কহিনুর একজনের কপালেই উঠে। সূর্য্যমুখী
ই কহিনুর। কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণিত করিবে?

"তবে কুন্দনন্দিনীকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন?
ন্তি! ভ্রান্তি! এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হই-
ছিল মরিবার জন্য। আমারও মরিবার জন্য এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গি-
ছে। এখন সূর্য্যমুখীকে কোথায় পাইব?

"আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি
হাকে ভাল বাসিতাম? ভাল বাসিতাম বৈ—কি! তাহার জন্য
াদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু
সে বুঝিতেছি, সে সকল চোকের ভালবাসা। নহিলে আজি
নয় দিবস মাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, 'আমি
হাকে ভাল ভাসিতাম? ভাল বাসিতাম কেন? এখনও ভালবাসি
ন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল?' * *"

নগেন্দ্রের কুন্দপ্রেম অনেকটা রূপজ মোহ বটে, কিন্তু ইহাতে
জ প্রেমও কিঞ্চিৎ মিশ্রিত ছিল। রূপজ মোহরূপ খাদ পুড়িয়া
া হইল, কিন্তু গুণজ প্রেমরূপ সুবর্ণকণিকাটুকু গলিয়া নির্ম্মল হইয়া
ড়য়া রহিল। এই জন্যই নগেন্দ্র হৃদয় হইতে কুন্দস্মৃতি মুছিয়া
লিয়াও বলিতে বাধ্য হইলেন—"এখনও ভাল বাসি"। কিন্তু
নগেন্দ্রের কুন্দপ্রেম-সুবর্ণকণাটুকু সেই সূর্য্যমুখীর প্রেমসাগরের
কটে আনীত হইল, অমনি সেই অতল জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল,
নি সূর্য্যমুখীস্মৃতি প্রবল হইয়া উঠিল—আর নগেন্দ্র বলিয়া উঠি-
ন, "কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল?"

হরদেব ঘোষাল প্রত্যুত্তরে নগেন্দ্রকে অনেক বুঝাইলেন; অনেক
দেশ দিলেন, বলিলেন "তুমি নিরাশ হইও না। সূর্য্যমুখী অবশ্য
াগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কতকাল থাকি-
? যতদিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও।
মার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও
হীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের

সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভাল বাসেন। ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না। * *"

"তদলব্ধপদং হৃদি শোকঘনে প্রতিযাতমিবাস্তিকমস্য গুরোঃ।" কিন্তু সেই গভীরভাবপূর্ণ সারগর্ভ উপদেশগুলি শোকাভিভূত নগেন্দ্রের অন্তরে স্থান না পাইয়া যেন বন্ধুবরের নিকট প্রত্যাগমন করিল। নগেন্দ্র উত্তরে লিখিলেন, "তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই বুঝিয়াছি, এবং তোমার পরামর্শ যে সৎপরামর্শ, তাহাও জানি। কিন্তু গৃহে মন স্থির করিতে পারি না। একমাস হইল, আমার সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার কল্পনা করিয়াছি। আমিও গৃহ ত্যাগ করিব। দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব। তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব; নচেৎ আর আসিব না। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিত্য ভর্ৎসনা করি—সে কাঁদে,—আমি কি করিব? আমি চলিলাম।"

নগেন্দ্রের এক্ষণে চিত্তোন্মাদ জন্মিয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক প্রিয়ম্বদতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি সামান্য দাস দাসীর প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, আজ অভাগিনী কুন্দের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিতেও অনিচ্ছুক। তিনি দুঃখিনী কুন্দকে সেই শূন্য পুরীতে হীরার হস্তে সমর্পণ করিয়া ও বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দাওয়ানের উপর ন্যস্ত করিয়া অচিরাৎ সূর্য্যমুখীর অন্বেষণার্থ নির্গত হইলেন।

নগেন্দ্র নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া সূর্য্যমুখীর কোন অনুসন্ধান না পাইয়া অবশেষে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় পৌঁছিয়া

গাবিন্দপুরে দাওয়ানকে সংবাদ দিলেন। দাওয়ান তাঁহার নামীয় ত চিঠিপত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর পত্রে র্য্যমুখী মধুপুরে হরমণি-নাম্নী এক বৈষ্ণবীর আলয়ে মৃত্যুশয্যায় য়ান—এই সংবাদ পাইলেন।

নগেন্দ্রের মস্তকে বজ্র পড়িল। তিনি কাতরস্বরে জগদীশ্বরের রণে এই ভিক্ষা চাহিলেন—"জগদীশ্বর! মুহূর্ত্ত জন্য আমার চেতনা াখ।" নগেন্দ্রের সে প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল—ক্ষণেকের জন্য নগেন্দ্রের ৈতন্য বিলুপ্ত হইল না। সেই অবসরে তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া কুম দিলেন "আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় রিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।"

কর্ম্মাধ্যক্ষও প্রভুর নিয়োগ পালন করিতে গেলেন—নগেন্দ্রও নাচ্ছাদিত ভূমিতলে শয়ন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

সেই রাত্রেই নগেন্দ্র মধুপুর যাত্রা করিলেন। শিবপ্রসাদ ব্রহ্ম- রীর পত্র অনেক দিন পরে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া নগেন্দ্রের মনে নানা- কার আশঙ্কা হইতে লাগিল। তাঁহার মনে স্বতঃ এইরূপ তর্ক ঠিল—আজও কি সূর্য্যমুখী সেইখানেই আছেন? যদি না থাকেন বে "এখন সূর্য্যমুখী কোথায়?"

নগেন্দ্র অনেক কষ্টে পাল্কীযোগে মধুপুরে আসিয়া কবিরাজ রাম- ধ্রায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট একটী একটী রিয়া প্রশ্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে এই অনুমানে উপনীত হইলেন যে, দোষে সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে।

বাতাহত কদলীর ন্যায় নগেন্দ্র চেয়ার হইতে ভূতলে পড়িয়া লেন। দারুণ আঘাতে মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল—মূর্চ্ছা ক্ষণকালের য় তাঁহার যাতনা হরণ করিল। কবিরাজ নগেন্দ্রের শুশ্রূষায় নিরত লেন।

নগেন্দ্রের অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল? কে ভাবিয়াছিল যে হার দুঃখে আজ পাষাণও বিগলিত হইবে? তিনি অতুল সম্পত্তি, নন্ত গুণরাশি, দুর্লভ স্ত্রীরত্নের অধিকারী হইয়াও—কেন আজ

পথের কাঙ্গালীরও শোচ্য? তাঁহার কোনও অভাব ছিল না, তথাপি একটী অভাবের সৃষ্টি করায় আজ তাঁহাকে সকল থাকিতে বলিতে হইল—"আমার এত দিনে সব ফুরাইল"।

"আমার এতদিনে সব ফুরাইল"—এই ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র সেই দিনই সন্ধ্যাকালে পাল্কীযোগে মধুপুর হইতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সূর্য্যমুখীর প্রাপ্তির আশার সহিত নগেন্দ্রের আজ সব ফুরাইল। তিনি গোবিন্দপুরের গৃহে বাস করিতে চলিলেন না; গৃহধর্ম্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয় আশয়ের বিলিব্যবস্থা করিতে হইবে। জমীদারী, ভদ্রাসন বাড়ী, এবং অপরাপর স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন—অস্থাবর সম্পত্তি সকল কমলমণিকে দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছুমাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর তিনি জীবিত থাকেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। কুন্দনন্দিনীকে কমলমণির নিকট পাঠাইবেন। আর সূর্য্যমুখী যে খাটে শুইতেন, সেই খাটে শুইয়া একবার কাঁদিবেন। সূর্য্যমুখীর অলঙ্কারগুলিন লইয়া আসিবেন। সে গুলি কমলমণিকে দিবেন না—আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাবেন, সঙ্গে লইয়া যাবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেই গুলি দেখিতে দেখিতে মরিবেন। এই সকল আবশ্যকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, নগেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশ পর্য্যটন করিবেন। আর যতদিন বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোথায় এক কোণে লুকাইয়া থাকিয়া দিন যাপন করিবেন"। নগেন্দ্র মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিতে করিতে শিবিকারোহণে গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

আজ সূর্য্যমুখী যদি নগেন্দ্রের এই সঙ্কল্প জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত দুঃখ দূর হইত!

নগেন্দ্রনাথ শিবিকায় শয়ন করিয়া আপনার অতীত জীবন-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া অনুশোচনাবিদ্ধ হইতে লাগিলেন—মনে মনে বলিলেন "সব আমারই দোষ। আমার তেত্রিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে আমার সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে যাহাতে মনুষ্য সুখী, সে সব আমাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে প্রায় কাহাকেও দেন না। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, মান, এসকল ভূমিষ্ঠ হইয়া অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলাম। বুদ্ধি নহিলে এ সকলে সুখ হয় না—তাহাতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় পিতা মাতা ত্রুটি করেন নাই—গোবিন্দপুরে আমার তুল্য সুশিক্ষিত কে? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা, তাহাও প্রকৃতি আমাকে অমিত হস্তে দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ—যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য—অশেষপ্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্য্যা—ইহাও প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল? আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজি আমার ধন, সম্পদ, মান, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সর্ব্বস্ব দিলে, যদি আমি আমার শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে স্বর্গসুখ মনে করিতাম। বাহক কি? এই দেশের রাজকারাগারে এমন কে নরঘ্ন পাপী আছে, যে আমার অপেক্ষা সুখী নয়, আমা হতে পবিত্র নয়? তারাত অপরকে হত করিয়াছে। আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয় দমন করিলে, সূর্য্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্য্যমুখী কি আমার কেবল স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত,

দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য! আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

সূর্য্যমুখী! আজ নগেন্দ্রের প্রেমসাগরে তোমার প্রেম-তরঙ্গিণী বিলীন হইল। আজ প্রেম-প্রদর্শনে নগেন্দ্রের নিকট তুমি পরাস্ত হইলে। তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী রমণী জগতে আজও জন্মে নাই। কালিদাসের নায়িকা শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্ত এবং ইন্দুমতীর জন্য অজ, কখন এমন গভীর প্রেমরাশি দেখাইতে পারেন নাই। এরূপ প্রণয়িনীময় স্বামীর আদর্শ রামচন্দ্র ভিন্ন আর কোন প্রণয়ী কখন দেখাইয়াছেন কি না জানি না। কবি এখানে তাঁহার ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

নগেন্দ্রের প্রেম-প্রদর্শন শুষ্ক চিন্তায় আবদ্ধ রহিল না। পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে, সূর্য্যমুখী পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াই পীড়াগ্রস্তা হইয়াছিলেন—অমনি নগেন্দ্র পাল্কী হইতে নামিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। পদব্রজে যাইতে যাইতে মনে করিলেন "ইহ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন—আমি সে সকল সুখভোগ ত্যাগ করিব। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, দাস, দাসী, বন্ধু, বান্ধবের আর কোন সংস্রব রাখিব না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আমিও সেই সকল ক্লেশ ভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানে যেখানে অনাথিনী স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব। যে অর্থ নিজ ব্যয়ার্থ রাখিলাম, সে অর্থে আপনার প্রাণধারণ মাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের

সেবার্থে ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্দ্ধাংশ আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যে ব্যয় করিবে, ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। * * *" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র পদব্রজে রাত্রি দুই প্রহরের সময় কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্রের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "সূর্য্যমুখী কোথায়?" নগেন্দ্র বলিলেন "স্বর্গে"। নগেন্দ্র পূর্ব্বে স্বর্গ মানিতেন না; কিন্তু এখন প্রেম ও বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "সূর্য্যমুখী কোথাও নাই" এ চিন্তা তিনি সহিতে পারিতেন না বলিয়া, "সূর্য্যমুখী স্বর্গে আছেন" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন। নগেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের মুখে তাঁহার অনুসন্ধানে ব্রহ্মচারীর গোবিন্দপুর ও কলিকাতায় আগমন, এবং ব্রহ্মচারীর মুখে শ্রুত সূর্য্যমুখীর বাটী হইতে বহির্গমন দিন হইতে যাবতীয় কষ্টবিবরণ শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন; অনেক যত্নে চৈতন্য সঞ্চার হইলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "সূর্য্যমুখী! প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি?" নগেন্দ্রের চক্ষে এতদিন জল ছিল না; আজ সেই সংরুদ্ধ স্রোত প্রবল বেগে বহিল। 'নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন। ইহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল।'

নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে প্রত্যাগমন করিয়া হৃদয়বেগ সংরুদ্ধ করিয়া ধীর ও প্রশান্তভাবে পৌরবর্গের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। সূর্য্যমুখীর কথাও মুখে আনিলেন না। তাঁহার গম্ভীর শোকে সকলেই কাতর হইল। নগেন্দ্র সকলের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কহিলেন "কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।"

নগেন্দ্রের আদেশানুসারে দাসীরা সূর্য্যমুখীর শয়নমন্দিরে নগেন্দ্রের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। নগেন্দ্রনাথ নিশীথকালে, সকলে নিদ্রা গেলে, একাকী সেই শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সে শয়নমন্দিরের

উপমান এ জগতে নাই। কবির মানসী সৃষ্টি বিধাতার সৃষ্টিকে পরাজিত করিয়াছে। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর অমানুষ প্রেম এই শয়নমন্দিরেই প্রতিভাত। এ মন্দির—ইন্দ্র ও শচী, মদন ও রতি, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, হর ও গৌরীর জন্যই যেন নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেই দম্পতিনিচয়ের কোনটা যেন মানবশরীর ধারণ করিয়া নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

'নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। * * খাটের পার্শ্বে আর একটী দ্বার খোলা ছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।' নগেন্দ্র একটী সোফার উপর বসিয়া অনেক কাঁদিলেন: উজ্জ্বল দীপালোকে সূর্য্যমুখীর অভিমত ছবিগুলি দেখিতে লাগিলেন। গৃহের দেওয়ালে একস্থানে সূর্য্যমুখীর স্বহস্তলিখিত এই অক্ষরগুলি দেখিতে পাইলেন—"১৯১০ সম্বৎসরে ইষ্ট দেবতা স্বামীর স্থাপনা জন্য এই মন্দির তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।" অশ্রুজলে নগেন্দ্রের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। ক্রমে দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল—নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। অকস্মাৎ ঝটিকা প্রবল হইয়া উঠিল—সেই ক্ষীণ দীপ ক্ষীণতর হইল। সেই অন্ধকারময় আলোকে নগেন্দ্র এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলেন। খাটের পার্শ্বস্থ 'সেই মুক্ত দ্বারপথে ক্ষীণালোকে এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রী-রূপিণী। * * স্ত্রী-রূপিণী মূর্ত্তি, সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা।' নগেন্দ্র অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ছায়া-প্রতি ধাবমান হইলেন। অমনি ছায়া অন্তর্দ্ধান করিল। ক্ষীণ দীপালোকও নির্ব্বাণ হইল। নগেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

ছায়াময়ী মূর্ত্তি মূর্চ্ছিত নগেন্দ্রকে ঊরুদেশে রাখিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নগেন্দ্রের চৈতন্য সঞ্চার হইল। তিনি কোমলতায় উপাধানকে রমণীর ঊরুদেশ বুঝিতে পারিয়া কুন্দনন্দিনী সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?"। রমণী কোন উত্তর দিলেন না। দুই এক বিন্দু অশ্রুজল নগেন্দ্রের গাত্রে পতিত হইয়া তাঁহাকে জানাইল যে, রমণী কাঁদিতেছেন। নগেন্দ্র তাঁহার গাত্রস্পর্শ

রিয়া সূর্য্যমুখী বলিয়া বোধ হওয়ায় চমকিত হইলেন। সূর্য্যমুখী অনেক দিন মরিয়াছেন, তাঁহার আগমন কিরূপে সম্ভব? বুঝিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিলেন। রমণী ধীরে ধীরে দ্বারোদ্দেশে চলিলেন। স্ত্রীমূর্ত্তি ক্ষণকাল দাঁড়াইল। নগেন্দ্র সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তির চরণতলে পতিত হইয়া কাতরস্বরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "তুমি দেবতাই হও, আর মনুষ্যই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব"।

রমণী এবার কথা কহিলেন—কি কহিলেন নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু স্বরসংযোগে সূর্য্যমুখী বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তীব্রবেগে দাঁড়াইয়া দণ্ডায়মানা রমণীকে হৃদয়ে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু শরীর ও মন অবসন্ন হওয়ায় বৃক্ষচ্যুত লতার ন্যায় রমণীর চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রমণী আবার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রত্যূষে নগেন্দ্রের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন, 'কুন্দ তুমি কখন আসিলে? আমি আজি সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিতেছিলাম সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইত?' রমণী অমনি বলিয়া উঠিলেন, "সেই পোড়ার মুখীকে দেখিলে যদি তুমি এত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ার মুখীই হইলাম"। নগেন্দ্র চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন। তাঁহার মন ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম—না সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এই বলিতে বলিতে নগেন্দ্র ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বামীর চরণযুগল ধরিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন, "উঠ, উঠ! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ,

উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি"।

নগেন্দ্রের ভ্রম বিদূরিত হইল। তিনি উঠিয়া সূর্য্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার বক্ষে মুখ রাখিয়া নির্বাক্ হইয়া অশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া কত রোদন করিলেন। একটি কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না।

ইহা বলা বাহুল্য যে, এই ছায়ানামক পরিচ্ছেদটী উত্তররামচরিতের ছায়ানামক অঙ্কের আদর্শে গঠিত। সে অঙ্কে তিরস্করিণী বিদ্যাপ্রভাবে রাম সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না, অথচ সীতা রামকে দেখিতেছেন। সংস্পর্শে রাম সীতা বলিয়া বুঝিতেছেন, অথচ সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। এই জন্য আপনার উন্মাদ আশঙ্কা করিতেছেন। তিরস্করিণীর অভাবে এখানে কবির নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের অবতারণা করিতে হইয়াছে। অন্ধকারময় আলোকে নগেন্দ্র ছায়াময়ী সূর্য্যমুখীকে চিনিতে পারেন নাই। ছায়া দেখিয়া প্রথমে তিনি মূর্চ্ছা যান। মূর্চ্ছাভঙ্গে স্পর্শে সূর্য্যমুখী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন বলিয়া নগেন্দ্র জানিতেন না। এই জন্য স্পর্শেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সীতা বাঁচিয়া আছেন বলিয়া রামও জানিতেন না, এই জন্য তাঁহারও স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রতি প্রত্যয় জন্মে নাই। পূর্ব্বদিকে যখন প্রভাতোদয় হইতে লাগিল, তখন নগেন্দ্র স্ত্রীমূর্ত্তিকে কতক কতক দেখিতে পাইলেন। শেষে রমণীর স্বর শুনিলেন—যত নগেন্দ্রের সন্দেহ ভঞ্জন হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনে বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। মৃতা সূর্য্যমুখী কোথা হইতে আসিলেন? ভয়ে ও বিস্ময়ে তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতা মৃতা বলিয়া রামচন্দ্রেরও সংস্কার ছিল, এই জন্য শুদ্ধ সীতাসংস্পর্শে রামচন্দ্রেরও সীতাজ্ঞান জন্মে নাই।

দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছাভঙ্গে অর্দ্ধবিভ্রান্ত নগেন্দ্র নিমীলিত নয়নে অঙ্কাশ্রয়দায়িনী রমণীকে কুন্দ মনে করিয়া যখন বলিতে লাগিলেন—

তখনও তিনি সূর্য্যমুখীর মৃতোত্থান সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন নাই। তাহার পর যখন সূর্য্যমুখী "আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম" বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন তখনও নগেন্দ্রের চৈতন্য হইল না। নগেন্দ্র কেবল আপনাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদে নগেন্দ্রের এরূপ অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সম্মুখবর্ত্তিনী মূর্ত্তিকে উন্মাদবিজৃম্ভিত ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। রমণীর চরণপ্রান্তে পতিত হওয়াতেই কেবল সেই ভ্রম বিদূরিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের নিকট বিচ্ছেদকালের সমস্ত আত্মবিবরণ বলিলেন। সমস্ত গোবিন্দপুর আনন্দে উথলিয়া উঠিল। সূর্য্যমুখীর সুখের আর ইয়ত্তা রহিল না। কিন্তু পৃথিবীর সুখ সকলই অনিত্য। সূর্য্যমুখী সুখ-সোপানে পা দিয়াছেন মাত্র এমন সময় এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নগেন্দ্র ও তাঁহার সুখ কিছু দিনের জন্য ব্যাহত হইল। কুন্দ নগেন্দ্রের অনাদরে বিষপান করিলেন।

—••—

নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র।

আমরা বিষবৃক্ষের সেই প্রকাণ্ড গ্রুপ হইতে নগেন্দ্র-চিত্রের স্বতন্ত্র ফটোগ্রাফ্ তুলিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধারণ করিলাম। নগেন্দ্রই বিষবৃক্ষের পুরুষচরিত্রের শিরোভূষণ। নগেন্দ্রের হৃদয় অতি উচ্চ ও উদাত্ত ভাবে পরিপূরিত। প্রণয়ই নগেন্দ্র-হৃদয়ের প্রবল ভাব। দেবেন্দ্রের প্রণয়ের ন্যায় নগেন্দ্রের প্রণয় কলুষিত ছিল না। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র উভয়েই কুন্দনন্দিনীর অলোকসামান্য রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; উভয়েরই চিত্ত অনিবার্য্য বেগে কুন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রের পঙ্কিল স্বভাব নানা অসৎ উপায়ে কুন্দকে গৃহত্যাগিনী করিয়া সামান্য বেশ্যার অবস্থায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে করায়ত্ত পাইয়াও পাছে কুন্দচরিত্রে কলঙ্কারোপ হয়, এই জন্য নিয়ত চিত্তসংযম করিয়াছিলেন। যখন চিত্তসংযমে অক্ষম

হইলেন—তখন অসংখ্য বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়াও কুন্দকে বি
করিলেন। নগেন্দ্রের স্থায় সুবিধা পাইলে দেবেন্দ্র হয়ত কুন্দকে হী
অবস্থায় পরিণত করিতেন। নগেন্দ্র ঘটনাস্রোতে অবনত একটী
ও উদাত্ত হৃদয়ের প্রতিকৃতি, দেবেন্দ্র প্রণয়ে হতাশ একটী অধঃপ
হৃদয়ের ছবি। মনস্বী ব্যক্তি একবার স্খলিতপদ হইলেও আবার উ
পারেন—নগেন্দ্র তাহার নিদর্শন। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি একবার পা
ক্রমেই নিম্ন হইতে নিম্নতম যাইতে থাকে—দেবেন্দ্র তাহার দৃষ্ট
চিত্তসংযমে অক্ষম যুবা পুরুষ প্রেমময়ী ভার্য্যায় বঞ্চিত হইলে ক
অধঃপাতে যাইতে পারে—দেবেন্দ্র তাহার নিদর্শন। প্রেমময়ী ভ
সত্ত্বেও ক্ষণিক চিত্তসংযমাভাবে মনীষীরও স্খলন অসম্ভব নয়—ন
তাহার দৃষ্টান্ত।

দেবেন্দ্র পড়িয়া নারকী, নগেন্দ্র উঠিয়া উজ্জ্বলতর দেবতা।
আর নগেন্দ্র-চরিত্রের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনার্থই দেবেন্দ্রের সৃষ্টি। দেবে
পাপের প্রায়শ্চিত্ত অতিঘোর ও দীর্ঘকালব্যাপী, নগেন্দ্রের স্খলনের
অতিকোমল ও ক্ষণিক।

শ্রীশ চন্দ্র।

যেমন নবীন শ্যামল পত্রদল একটী পুষ্পস্তবকের শোভা স
করে, সেইরূপ শ্রীশচন্দ্র এই গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে
দেবেন্দ্রের হতাশ প্রণয় ও নগেন্দ্রের প্রতিহত প্রণয়ের মধ্যস্থলে
চন্দ্রের সন্তুষ্টকৃত ও অপ্রতিহত প্রণয়ের ছবি অতি সুন্দর। শ্রী
পত্নীগতপ্রাণ একটী সভ্য বাঙ্গালী বাবুর প্রতিকৃতি। তিনি কমলম
হস্তে একটী ক্রীড়নক মাত্র। কমলমণি উঠ বলিলে শ্রীশচন্দ্র উঠি
বস বলিলে বসিতেন। কমলমণি যেখানে, শ্রীশও সেইখানে। ক
মণির বুদ্ধির নিকট তাঁহার বুদ্ধি নিষ্প্রভ হইত। কমলমণির হৃদয়
নিকট তাঁহার হৃদয় হার মানিত। কমলমণির প্রবলতর চরি
নিকট তাঁহার ক্ষীণতর চরিত্র বৈষ্ণবী বৃত্তি অবলম্বন করিত। ক
মণির ন্যায় প্রবলতর চরিত্রের যে তিনি উপাস্য দেবতা হইয়াছি
ইহা অপেক্ষা শ্রীশের গুণের অধিকতর পরিচয় দিবার আর কিছুই অ

শ্রীশচন্দ্রের চরিত্রে কোন প্রবল দোষও নাই। যে সকল সামাজিক ও পারিবারিক গুণ থাকিলে মনুষ্য সুখে স্বচ্ছন্দে ও নির্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, শ্রীশে কেবল সেই সকল গুণ ছিল; কিন্তু যে সকল দোষ থাকিলে মানুষ সামাজিক ও পারিবারিক সুখে বঞ্চিত হয়, শ্রীশে সে সকল দোষ কিছুই ছিল না। শ্রীশের জীবন প্রশান্ত ও সুন্দর শীতকালের স্রোতস্বিনী।

দেবেন্দ্রের চরিত্র বর্ষাকালীন যে তবিনীর ন্যায় আবিল। দেবেন্দ্রে যে সকল সামাজিক গুণ ছিল, যে টুকু সহৃদয়তা ছিল, তাহাতে কমলমণির মত সহৃদয়া প্রেমময়ী ভার্য্যা পাইলে হয় ত তিনি শ্রীশের ন্যায় একটী সামাজিক সাধু লোক হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু কি শ্রীশ কি দেবেন্দ্র—কেহই নগেন্দ্রের অত্যুচ্চ চরিত্রের নিকটেও যাইতে অক্ষম।

সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী।

বঙ্কিমবাবু পুরুষচরিত্রে যেমন নগেন্দ্রে স্বর্গীয়, শ্রীশে পার্থিব, ও দেবেন্দ্রে নারকীয় প্রেমের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন; সেইরূপ স্ত্রী-চরিত্রে সূর্য্যমুখী ও কুন্দে স্বর্গীয়, কমলমণিতে পার্থিব এবং হীরায় নারকীয় প্রেমের ছবি দেখাইয়াছেন।

সূর্য্যমুখী ও কুন্দ স্বর্গীয় প্রেমের দুইটী বিভিন্ন আকৃতি। উভয়েরই হৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ। উভয়েরই হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেব নগেন্দ্র। এ জগতে নগেন্দ্র ভিন্ন উভয়েই আর কিছুই জানিতেন না।

সূর্য্যমুখীর প্রেম অনন্ত ও অসীম, কুন্দের প্রেম অতলস্পর্শ। সূর্য্যমুখী একটী বিকসিত কুসুম, কুন্দ একটী কুসুম-কোরক। সৌরভে উভয়েই জগজ্জনমনোরঞ্জন। একজন হৃদয়ের প্রত্যেক দল খুলিয়া সকলকে দেখাইতেছেন, আর একজনের হৃদয়দল লজ্জায় আকুঞ্চিত। একজন লজ্জাবতী লতা, আর একজন বন-জ্যোৎস্না নবমালিকা। একজন প্রগল্ভা, একজন মুগ্ধা। একজন সাহসিনী, একজন ভয়-

বিহ্বলা। একজন বাক্‌পটু, একজন বাক্যবিধুরা। একজন লৌকিক
একজন সংসারানভিজ্ঞা। যে সাবিত্রীচিত্রে ব্যাস ও যে সীতা
বাল্মীকি জগৎ চমকিত করিয়াছিলেন, এবং যে ডেস্‌ডিমোনা
সেক্ষপীয়র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন; সূর্য্যমুখী
চিত্র ; এবং যে শকুন্তলাচিত্রে কালিদাস এবং যে মিরান্দাচিত্রে
পীয়র জগতের আরাধ্য হইয়াছেন, কুন্দ সেই শ্রেণীর চিত্র। আ
চিত্রে যে সৌন্দর্য্য সূর্য্যমুখীতে তাহা বর্ত্তমান, কপালকুণ্ডলার
সৌন্দর্য্য কুন্দে তাহা বিদ্যমান। আয়েষা রেবেকার প্রতি
রেবেকা পাশ্চাত্য রমণীর প্রতিকৃতি ; সূর্য্যমুখীতেও পাশ্চাত্য-র
প্রগল্‌ভতা ও সাহস বিদ্যমান। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিদুহিতা,
তার প্রৌঢ়াবস্থার ছবি নহে, জাতীয় শৈশবের ছবি—মৃতোত্থিত
তেই এ চিত্রের অস্তিত্ব সম্ভব ; সেই কপালকুণ্ডলার সংসারানভি
মুগ্ধতা ও সরলতা কুন্দে বিদ্যমান। সূর্য্যমুখী সীতা ও ডেস্‌ডিমে
সংমিশ্রণ, কুন্দ শকুন্তলা ও মিরান্দার সংমিশ্রণ। সূর্য্যমুখীর ন
ময়তা—সূর্য্যমুখীর প্রতি কার্য্যে ও প্রতি কথায় পরিব্যক্ত ; কু
নগেন্দ্রময়তা কুন্দের হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে নিগূহিত। নগে
দেখিলে আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রবের ন্যায় সূর্য্যমুখীর হৃদয় উচ্চ
হইয়া সহস্র স্রোতে বাক্যে প্রবাহিত হইত ; কুন্দের হৃদয়ে যে
তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন করিত—নগেন্দ্রকে দে
ভাবপ্রাবল্যে কুন্দের হৃদয় ফাটিবার উপক্রম হইত। উদ্যমশী
বাক্যপটু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে যতখানি ভাল বাসিতেন, তাহা ব
ও বাক্যে প্রকাশ করিতেন ; ভাবময়ী ও বাক্যবিধুরা কুন্দ নগে
প্রতি ভালবাসা নগেন্দ্রের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করি
নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর হৃদয়ের প্রতি অক্ষর পড়িতে পাইতেন ; কিন্তু
হৃদয়ের জলন্ত বর্ণগুলিও তিনি দেখিতে পাইতেন না। সূর্য্য
হৃদয় শরৎকালীন পূর্ণ শশধর—নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও স্থূলদৃষ্টিরও গো
কিন্তু কুন্দের হৃদয় শারদীয় তারকা—নির্ম্মল, উজ্জ্বল কিন্তু
অন্য জগতের প্রকাণ্ড সূর্য্য—সূক্ষ্মদর্শনেরও সম্পূর্ণ গোচর

নিরাবরণ পরীদেহের যে সৌন্দর্য্য, সূর্য্যমুখী-হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্য—তৃপ্তিপ্রদ, অতুল ও মঙ্গলকর; অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরীর যে সৌন্দর্য্য কুন্দ-হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্য—সাকাঙ্ক্ষ, অনুপম ও উন্মাদক।

সূর্য্যমুখী।

সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা প্রতিবাক্যে পরিব্যক্ত। "পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, ত সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; * * পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ।" "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল তুমিই আমার পরকাল। তোমার কাছে কেন লুকাইব? কখন কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন একজন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব?" এই সকল বাক্যের প্রতি অক্ষরে নগেন্দ্রময়তা দেদীপ্যমান।

সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা শেষে আত্মোৎসর্গে ও আত্মবিসর্জ্জনে পরিণত হইয়াছিল। নগেন্দ্রের স্বার্থ, নগেন্দ্রের সুখ, নগেন্দ্রের জ্ঞান হইতে সূর্য্যমুখীর স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র সুখ ও স্বতন্ত্র জ্ঞান ছিল না। "তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না।" এইখানে আত্মজ্ঞানের অপলাপ। "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি—তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই ," "আমার সর্ব্বস্বধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?" "আমি কে? একবার তোমার দাদাকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস; তখন জানিবে তোমার দাদা আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? যাঁহার এক দণ্ডের অসুখ

দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম, দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তি অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যো করিলেন—তবে আমার সুখ কি রহিল? বলিলাম, 'প্রভো! তোমা সুখেই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব,- তাই বিবাহ করিয়াছেন।"—এই গুলি আত্মস্বার্থ ও আত্মস জীবিতসর্ব্বস্ব নগেন্দ্রের চরণে উৎসর্গ করার জাজ্বল্যমান নিদর্শ বাল্মীকির সীতা ও ব্যাসের সাবিত্রী ভিন্ন আর কোন আর্য্য কবি মানসী কন্যা আত্মোৎসর্গের এরূপ পরিচয় দিয়াছেন কি না জা না।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মানুষে যে দেবতাকে সর্ব্বোৎকর্ষের আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করে, সূর্য্যমুখী সে রূপ নগেন্দ্রকে সর্ব্বোৎকর্ষের আদর্শ বলিয়া জানিতেন। নগেন্দ্র তাঁহ চক্ষে অপাপবিদ্ধ দোষস্পর্শশূন্য একটী আদর্শ পুরুষ। সূর্য্যমুখী য পত্রে কমলমণির নিকট আপনার হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিতেছেন তখন পাছে সেই যাতনা-প্রদাতার উপর কমলমণির ক্রোধ উদ্দীপি হয়, পাছে কমলমণি ভাবেন সূর্য্যমুখী আত্মযাতনা ব্যক্ত করি যাতনা-প্রদাতাকে প্রকারান্তরে তিরস্কার করিতেছেন—এই আশঙ্ক সূর্য্যমুখী লিখিলেন "তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আ তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না।"

নগেন্দ্র যখন সূর্য্যমুখীকে পায় ঠেলিলেন, তখনও সূর্য্যমু ভাবিয়া নগেন্দ্রের দোষ পাইলেন না, আত্ম-অদৃষ্টের উপরও মনে করিতে পারিলেন না—কমলকে বলিলেন, "আমার কপালের চে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্—সে সকলও তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর আমার কপাল জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?" সূর্য্যমু আপনার দুঃখের কারণ নগেন্দ্র ও নিজ অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছু স্থি করিলেন।

নগেন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর গুণবানের অস্তিত্ব সম্ভব বলিয়া সূর্য্যমুখীর বোধ ছিল না। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কমলমণির নিকট বিদায় গ্রহণ কালে রোদন করিতে করিতে সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান্ হও। ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।"

স্বামীর প্রেমই সূর্য্যমুখীর ইহকাল ও পরকাল। যে দিন সেই স্বামি-প্রেমে বঞ্চিত হইলেন—যে সময় তিনি নগেন্দ্রের মুখে শুনিলেন "তোমাতে আমার আর সুখ নাই। * * আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি—" সেই দিন সেই সময় সূর্য্যমুখীর হৃদয়ে শেল বিঁধিল, তিনি বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে।" এত দিনে সূর্য্যমুখীর আত্মস্মৃতি বলবতী হইল। এত দিনে সূর্য্যমুখী জানিলেন নগেন্দ্র হইতে সূর্য্যমুখী পৃথক্—সূর্য্যমুখীর সুখ আর নগেন্দ্রের সুখ এক নহে। তখন সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র যে সুখের প্রত্যাশী তাঁহাকে সেই সুখে সুখী করিয়া দেশত্যাগিনী হইলেন। যাইবার সময় একখানি পত্রে মনের কথা সমস্ত লিখিয়া কমলমণির জন্য রাখিয়া গেলেন। এই পত্রখানিতে সূর্য্যমুখীর তদানীন্তন হৃদয়ের ছবি সম্পূর্ণ রূপে প্রতিবিম্বিত। পত্রখানি এই :—

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনে মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখন পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব। কেন না আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

"কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ কি
যাইতাম। কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আ
বং করিলাম, সেই সুখ দুই একদিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার
ছিল। * * আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন, ই
দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম

*   *   *

"আমার যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, এমন ভরসা না
কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না—এবং আ
সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভি
রিণী-বেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করি
আমাকে কে চিনিবে? * আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া চ
লাম—সোণা রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

"তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চ
আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। * তাঁহাকে বুঝাইয়া বা
, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁ
উপর আমার রাগ নাই; কখন তাঁহার উপর রাগ করি নাই, ক
করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি
হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি তাহাই রহিল, যতদিন না মাটী
এ মাটী মিশাও, ততদিন থাকিবে; কেন না তাঁহার সহস্র গুণ
কখন ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আ
তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতা
তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আ
জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় ল
লাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগি
হইতেছি।

"তোমারও কাছে জন্মের মত বিদায় লইলাম * * আরও আ
র্ব্বাদ করি, যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দি
যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই

এই পত্রে সূর্য্যমুখীর বলবতী আত্মস্মৃতি ও প্রবল আত্মজ্ঞান জাজ্বল্যমান। যতদিন সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের আদরিণী ছিলেন, ততদিন এ পৃথিবী সূর্য্যমুখীর নিকট স্বর্গ বোধ হইয়াছিল এবং নগেন্দ্র সেই স্বর্গের দেবতা বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন; ততদিন সূর্য্যমুখী নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলেন; নগেন্দ্রের জীবনে, ও নগেন্দ্রের সুখে—তাঁহার জীবন, ও তাঁহার সুখ বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তখন তিনি জানিতেন যে নগেন্দ্রকে সুখী করিতে পারিলেই তাঁহার সুখ, কারণ নগেন্দ্র তাঁহারই, সুতরাং নগেন্দ্রের সুখ তাঁহারই সুখ। এইজন্য তিনি নগেন্দ্রের সুখবর্দ্ধনে নিরত ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল—আত্মস্মৃতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। তিনি দেখিলেন নগেন্দ্র যাহাতে সুখী, সে সূর্য্যমুখী নহে—কুন্দনন্দিনী। তিনি নগেন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন বলিয়া নগেন্দ্রের সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিলেন—দেখিয়া পরিতৃপ্তি জন্মিল। এতদিন নগেন্দ্রের সুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীর পরিতৃপ্তি জন্মে নাই, কারণ এতদিন সে সুখের অর্দ্ধাংশভাগিনী তিনি স্বয়ং ছিলেন। আজ পরিতৃপ্তি জন্মিল, কারণ আজ সে সুখের অর্দ্ধাংশভাগিনী কুন্দ।

আজ সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী, কারণ আজ নগেন্দ্রের স্বার্থ—সূর্য্যমুখীর স্বার্থ নহে। এতদিন পরে আজ সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রে সহস্র গুণের সহিত একটি দোষ দেখিলেন, কারণ আজ নগেন্দ্র তাঁহার প্রতি বিমুখ। আজ সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্রমমতার সহিত তাঁহার স্বার্থপরতার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। স্বার্থপরতা বিজয়িনী হইল—সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইলেন। কি স্বার্থসাধনোদ্দেশে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইলেন? নিজের সুখ? না—কারণ নগেন্দ্র বিনা সূর্য্যমুখীর সুখ কোথায়? তবে কি জন্য? নিজের সুখের ব্যতিঘাতে পরের সুখের উৎপত্তি দেখিতে অসমর্থতা নিবন্ধন। তবে সূর্য্যমুখী কি নগেন্দ্র-সুখদর্শন-কাতরা হইয়াছিলেন? না—নগেন্দ্রের সুখ তিনি অম্লান-বদনে দেখিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু সে সুখের সহিত কুন্দের সুখ তাঁহার অসহনীয়। যে সপত্নী-দ্বেষ স্ত্রী-সাধারণে বিদ্যমান, সূর্য্যমুখীর অপা-

থীর হৃদয় সে পার্থিব ভাবকে আজ জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিল
এ পরাজয়ের কারণ আত্মবিশ্লিষ্ট ভাবে নগেন্দ্রকে ভাল বাসা তাঁহা
কখনই শিক্ষা হয় নাই। যখনই তিনি নগেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছে
তখনই জানিতে পারিয়াছেন—নগেন্দ্র তাঁহার। নগেন্দ্র তাঁহা ভি
আর কাহারও হইতে পারেন—এ ভাব ইহার পূর্ব্বে সূর্য্যমুখীর মে
আর কখন উদিত হয় নাই। এজন্য সহসা এ ভাব-পরিবর্ত্তন তাঁহা
অসহনীয় হইল।

আয়েষা যখন জগৎসিংহকে প্রথমে দেখেন, তখন হইতেই তি
জানিতেন জগৎসিংহ হিন্দু, তিনি নবাব-দুহিতা; জগৎসিংহ তাঁহ
নহেন এবং কখনও হইতেও পারেন না। এই জন্য তিনি যখন ম
মনে জগৎসিংহকে পতিত্বে বরণ করেন, তখনই প্রস্তুত হন যে
জীবন জগৎসিংহকে শুদ্ধ ভাল বাসিয়াই অতিবাহিত করিবেন
এ প্রেমের প্রতিদান পাইবেন না। আশা ছিল না বলিয়
আয়েষার স্বর্গীয় প্রেমের পার্থিব ভাবের সহিত কখন কোন সং
উপস্থিত হয় নাই। সূর্য্যমুখীর আশা ছিল, এবং তাঁহার মনে আ
ভঙ্গের সম্ভাবনা পর্য্যন্তও কখন উদিত হয় নাই; এই জন্য আশাভঙ্গে
চিত্তস্থৈর্য্যের আবশ্যকতা—তাঁহার তাহা শিক্ষা হয় নাই। এই জ
নগেন্দ্রের সহিত কুন্দকে সংশ্লিষ্ট দেখিয়া আশাভঙ্গে আজ তিনি গ
কাঙ্গালিনী হইলেন। এই জন্য আজ জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-সমাগমে আ
ষার ন্যায়, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র-কুন্দ-সমাগমে চিত্তের গাম্ভীর্য্য ও স্থৈর্য্য
দিনের অধিক রক্ষা করিতে পারিলেন না। নিঃস্বার্থ ও নিরাশ প্রণয়ের
স্বর্গ হইতেও উচ্চতর ভাব, স্বর্গের সুখ অপেক্ষাও পবিত্রতর সুখ, অ
সে ভাবে ও সে সুখে তিনি বঞ্চিত হইলেন। নিরবচ্ছিন্ন-দেব-ভাব-
আয়েষার নিকট দেব-মানব-ভাব-পূর্ণ সূর্য্যমুখী আজ পরাস্ত হইলে
নিরভিসন্ধি ধর্ম্মের নিকট স্বার্থসংশ্লিষ্ট ধর্ম্ম পরাজিত আজ হইল।
পরাজয় হইতেই উপন্যাসের অবশিষ্ট ঘটনা প্রসূত। সূর্য্যমুখীর গৃ
ত্যাগ, তদনুসন্ধানার্থ নগেন্দ্রের দেশপর্য্যটন, নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর অ
কষ্ট যন্ত্রণা; সূর্য্যমুখী-প্রেমপ্রাবল্যে নগেন্দ্রের কুন্দের প্রতি অনাদ

সেই অনাদরে কুন্দের বিষপান—এই সমস্ত ঔপন্যাসিক ঘটনাই এই পার্থিব ভাবের নিকট স্বর্গীয় ভাবের পরাজয়ের ফল। যদি সূর্য্যমুখী নিরাশ ও নিরাকাঙ্ক্ষ প্রণয়ের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিতেন, তাহা হইলে শুদ্ধ নগেন্দ্রকে দেখিয়াই তাঁহার অতুল আনন্দ জন্মিত—নগেন্দ্রের সুখ দেখিয়া তাঁহার পর্য্যাপ্তি বোধ হইত না; তিনি গৃহে থাকিয়া শুদ্ধ নগেন্দ্রকে দেখিয়াও সুখী হইতেন, এবং নগেন্দ্রের সুখে নিজ হৃদয় ভরিয়া ফেলিতেন; সে সুখ ছাড়িয়া তিনি কখনই গৃহ-ত্যাগিনী হইতেন না। তিনি সীতার ন্যায় বলিতেন "আমাকে সামান্য প্রজাভাবে দেখিলেও আমি চরিতার্থ হইব" *। তাহা হইলে নগেন্দ্রেরও বৈরাগ্য অবলম্বন করার প্রয়োজন হইত না, কুন্দকেও বিষপান করিতে হইত না। কিন্তু তাহা হইলে সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র, কুন্দ, কমলমণি ও হীরা এ কয়টী চিত্রই অপরিপুষ্ট থাকিত; ঘটনা-বৈচিত্র্যাভাবে কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিষবৃক্ষ একটী সামান্য উপন্যাসরূপে পরিণত হইত।

নগেন্দ্রের সহিত সূর্য্যমুখীর অনেক দিন দেখা না হওয়ায় সূর্য্য-মুখীর আত্মস্মৃতি আবার বিলুপ্ত হইল। নগেন্দ্রময়-জীবিতা সূর্য্যমুখী আবার আত্ম ভুলিয়া নগেন্দ্র-ধ্যানে নিরতা হইলেন। এবার সূর্য্যমুখী আত্মবিশ্লিষ্ট ও অন্তসংশ্লিষ্ট ভাবে নগেন্দ্রকে ভাল বাসিতে শিখিয়া-ছিলেন। এবার ভালবাসার প্রতিদান-নিরপেক্ষ হইয়া সূর্য্যমুখী নগে-ন্দ্রকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। তিনি নগেন্দ্রের হৃদয়েশ্বরী না হইতে পারেন, কিন্তু নগেন্দ্র ত তাঁহার হৃদয়েশ্বর—এই ভাবে তিনি এবার হৃদয়ে নগেন্দ্রপূজা আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যমুখী এখন কেবল নগেন্দ্রের দর্শনমাত্র-পিপাসু হইলেন। নগেন্দ্র যাহারই হউন না কেন, নগেন্দ্র-দর্শনেই সূর্য্যমুখীর স্বর্গলাভ। সূর্য্যমুখী পাতিব্রত্য-ধর্ম্মজনিত পুণ্যের এক মাত্র ফলস্বরূপ নগেন্দ্রদর্শনের ভিখারিণী হইলেন। তিনি ব্রহ্ম-

* নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ।
নির্বাসিতাপ্যেবমতস্ত্বয়াহং তপস্বিসামান্যমবেক্ষণীয়া॥
রঘুবংশম্।

স্বামীর পত্র প্রেরণের পর হৃদয় ভরিয়া জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্রখানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।"

সূর্য্যমুখী পত্রের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। নগেন্দ্র-দর্শনলালসা তাঁহাকে এতদূর প্রদীপ্ত হইল যে, তিনি ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া গোবিন্দপুরাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে নগেন্দ্র তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকক্ষে শয়ান, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ, এই অবস্থায় ছায়ারূপে নগেন্দ্রকে দেখা দিলেন। মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণের পর সহসা পূর্ণ দর্শনে আনন্দাতিশয্যে নগেন্দ্রের শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে—এই ভাবে সূর্য্যমুখী কবির অদ্ভুত কৌশলে কেমন ধীরে ধীরে নগেন্দ্রের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া অবশেষে এই বলিয়া নগেন্দ্রের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন, যে তিনি মরেন নাই এবং তাঁহার সম্মুখেই উপস্থিত—"উঠ! উঠ! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ! উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি"।

বিচ্ছেদে সূর্য্যমুখীর ঈর্ষানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, আত্মবিস্মৃত ভাবে নগেন্দ্রকে ভাল বাসিতে শিখায়, কুন্দের অস্তিত্ব আর সূর্য্যমুখীর ক্লেশকর বোধ হইল না। যে সূর্য্যমুখী গৃহপরিত্যাগ কালে কমলকে লিখিয়া গিয়াছিলেন "কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না এবং আমার সন্ধানও পাইবে না," সেই সূর্য্যমুখী আজ গৃহে প্রত্যাগতা হইয়া কমলের কাণে কাণে বলিলেন, "চল, তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—না তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।"

যে সূর্য্যমুখী একদিন কুন্দকে স্বামিপ্রেমের অংশ দিতে কাতর
ওয়ায়, "আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি
খন স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে,
এ আমি ঐ খানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের
উপর পা রাখিয়া যাইতেন।"—পতিপরায়ণতার এই অলৌকিক ভাব
ক্ত করার পরও, কমলমণি কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন:
তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে। তবে কেন
ল 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে
না; নাহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?" —
সেই সূর্য্যমুখী আজ কুন্দকে লইয়া স্বামীর ঘর করিতে স্বীকৃতা হইয়া
ছেন। কিন্তু নায়িকা কুন্দের প্রতি পাঠকবর্গের মনকে অধিকতর
শোক-প্রবণ করিবার জন্য, তাঁহাদিগের হৃদয়ে কাব্যের নৈতিক ফল
অক্ষরে অঙ্কিত করিবার জন্য, এবং কবির অলৌকিক মানসী
কন্যা সূর্য্যমুখীও পাছে কুন্দ সহ একত্র সহবাস নিবন্ধন স্ত্রীসুলভ
দ্বেষাদির বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বর্গীয় ভাব হইতে বিচ্যুত হন—এই
জন্য কবি সূর্য্যমুখীর গৃহে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই স্বহস্তে
স্বহস্তলালিতা অনাথিনী কুন্দকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলি-
লেন। অপার্থিব সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের নিকট রোদন করিতে করিতে
বলিলেন, "কুন্দকে আমি বালিকা বয়স হইতে মানুষ করিয়াছি:
এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর
করিব সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সে সাধে ছাই পড়িল।
কুন্দ বিষপান করিয়াছে।" অবিদ্বেষের ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত
আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই চিত্তসংযম আর কিছুদিন পূর্ব্বে
হইলে, সূর্য্যমুখীর চরিত্রশশধর নিষ্কলঙ্ক থাকিত, এবং সূর্য্যমুখীর স্বর্গীয়
ত্বর বিন্দুমাত্রও পার্থিব-ভাব-মিশ্রিত হইত না। সূর্য্যমুখী কাঁদিতে
কাঁদিতে কুন্দের নিকট গিয়া কথঞ্চিৎ রোদন সম্বরণ করিয়া কুন্দের
প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতী! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট
আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রা-

ত্যাগ করি।" ইহা অপেক্ষা আদর্শসতীর প্রার্থনা আর কি হইতে পারে?

কুন্দনন্দিনী।

সূর্য্যমুখী সততভুক্ত ক্ষণমাত্র-বিচ্ছিন্ন অসীম ও অনন্ত প্রেমের ছবি, কুন্দ সতত নিরাশ ক্ষণমাত্রভুক্ত গভীর ও অতলস্পর্শ প্রেমের প্রতিকৃতি। সূর্য্যমুখী চিরদিন স্বামিসোহাগিনী ছিলেন, কুন্দচ্ছায়ায় সে সোহাগ কেবল কয়দিন মাত্র আবরিত হইয়াছিল; কুন্দ কয়দিন মাত্র নগেন্দ্র-প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। অভাগিনীর জীবন চিরদিনই নিরাশ প্রণয়ের অন্তর্দাহে ভস্মীভূত হইয়াছিল। সূর্য্যমুখী পত্নী, আদরিণী, সকল বিষয়েই তাঁহার অধিকার, কুন্দ নিরাশ্রয়া নগেন্দ্র-প্রতিপালিতা অনাথা বিধবা, সুতরাং নগেন্দ্র-প্রাপ্তির আশাও হৃদয়ে লালিত করিতে অক্ষম। অথচ ধীরে ধীরে বালিকার সেই নিরাশ হৃদয়ে নগেন্দ্রপ্রেম অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। সরলা সংসারানভিজ্ঞা বালিকার হৃদয়ও প্রেমের অস্পৃশ্য নহে। বহ্নিমুখ-বিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় সরলা নগেন্দ্রপ্রেমানলে ঝাঁপ দিলেন। নগেন্দ্রের করুণাপূর্ণ দেবমূর্ত্তি কুন্দের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। দেব যেমন মানবীর অলভ্য ও উপাস্য, নগেন্দ্রও কুন্দের নিকট সেইরূপ অলভ্য ও উপাস্য মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেন। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর হৃদয়াকাশের চন্দ্র, কুন্দের হৃদয়াকাশের সূর্য্য। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের সহস্র গুণের সহিত একটী কলঙ্করেখাও দেখিতে পাইতেন; কিন্তু নগেন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যে কুন্দের দৃষ্টি প্রতিহত হইত। সূর্য্যমুখী প্রাণ ভরিয়া নগেন্দ্রকে দেখিতেন, যতবার দেখিতেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইতেন; কুন্দ-দৃষ্টি নগেন্দ্রকে ধারণা করিয়া উঠিতে পারিত না। সূর্য্যমুখী তুলনা করিয়া নগেন্দ্রকে পুরুষরত্ন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কুন্দ পৃথিবীতে

ন্দ্রের তুলনা আছে বলিয়া জানিতেন না। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর আদর্শ পুরুষ, কিন্তু কুন্দের উপাস্য দেবতা। দেবচরিত্র যেমন দের অনালোচ্য, নগেন্দ্রচরিত্র সেইরূপ কুন্দের অনালোচ্য ছিল। ন্দ্রের দোষ-গুণ-গ্রহে কুন্দের কখন সাহস হয় নাই। নগেন্দ্র সূর্য্যর আদর্শ মানব, সুতরাং নগেন্দ্রের সহস্র গুণ ও একটী দোষও মুখীর পর্য্যবেক্ষণ এড়াইতে পারে নাই। সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র-প্রেম নতঃ বুদ্ধি-বৃত্তিমূলক; কুন্দের নগেন্দ্র-প্রেম সর্ব্বথা হৃদয়বৃত্তিমূলক। মুখী জানিতেন নগেন্দ্রকে তিনি কেন এত ভাল বাসেন—নগেযত গুণ এত গুণ মানবে দুর্লভ; কিন্তু কুন্দ জানিতেন না যে, ন্দ্রের প্রতি তাঁহার হৃদয় কেন এত অনিবার্য্য বেগে আকৃষ্ট হয়-বুদ্ধি নগেন্দ্রকে দেখিলে জড়ীভূত হইয়া নগেন্দ্রের দোষ-গুণবে অসমর্থা হইত। 'প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, য় আত্মবিসর্জ্জন' ইহা দ্বারা বঙ্কিমবাবু যে প্রণয়ের উল্লেখ করিয়া—এবং ভবভূতি "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যদ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ। কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্ * * ।" 'যে প্রেম সুখ ও দুঃখ এবং সকল অবস্থায় অবিচলিত, যাহাতে হৃদয়ের বিশ্রাম, বার্দ্ধক্য যাহার রস হরণ করিতে পারে নাই, যে প্রেম বহুকাল-সংসর্গে লজ্জাভয়াদি সঙ্কোচত্যাগে ক্রমে স্নেহসারে পরিণত হয়'—এই শ্লোকে ভবভূতি যে প্রণয়ের বর্ণন করিয়াছেন, সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র-বিষয়ক প্রেম সেই প্রেম। আর ভূয়সা জীবিধর্ম্ম এষ রসময়ী কস্যচিৎ ক্বচিৎ প্রীতিঃ * * ব্যতিসংখ্যেয়মনিবন্ধনং প্রেমাণমামনন্তি। অহেতুঃ পক্ষপাতো যস্তস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া। স হি স্নেহাত্মক-তন্তুরন্তর্মর্ম্মাণি সীব্যতি॥"—দেখিতে পাওয়া যায় কাহার প্রতি কাহারও হৃদয় স্বতঃই প্রীতিপ্রবণ হয়। সেই প্রণয়ের মূল অনুসন্ধান করা দুরূহ, তাহাকেই নিষ্কারণ প্রেম বলা যাইতে পারে। যে প্রেম নিষ্কারণ, তাহা অপ্রতিবিধেয়; প্রণয় দুইটী হৃদয়কে অনুস্যূত করিয়া দেয়'—ইত্যাদি দ্বারা ভব-

ভূতি যে অহেতু ও অপ্রতিবিধেয় প্রেমের উল্লেখ করিয়াছেন, কুন্দের নগেন্দ্রবিষয়ক প্রেম সেই প্রেম। বঙ্কিমবাবু কুন্দ এই প্রেমের ছবি দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রেমের বিশ্লেষণ ও বিবরণস্থলে এই অহেতু ও অপ্রতিবিধেয় প্রেমের কোনও উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার মতে— সকল প্রেমই সহেতু; রূপ হইতে গুণ হইতে বা উভয় হইতেই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভবপর, বিনা রূপ গুণ মোহে প্রেমোৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু তিনি নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের প্রেম কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা বলেন নাই। সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রের পরস্পরপ্রেম গুণজ, নগেন্দ্রের কুন্দপ্রেম রূপজ—কিন্তু কুন্দের নগেন্দ্র-প্রেম কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহার তিনি কিছু উল্লেখ করেন নাই। দুইটী রমণীকে দেখিলাম, একটী পরমা সুন্দরী, অপরাটী অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টা, উভয়েরই গুণ আমার নিকট অবিদিত; অথচ নিকৃষ্টার প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল—বঙ্কিম বাবু এরূপ ঘটনার রহস্যোদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করেন নাই। ভবভূতি তাহার রহস্যোদ্ভেদে অক্ষম হইয়া সেই প্রেমকে অকারণ বা অলৌকিক-কারণজনিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

জ্বলনোন্মুখ বহ্নির ন্যায় নগেন্দ্রপ্রেম কুন্দের হৃদয়ে প্রধূমিত হইতেছিল, আজ কমলমণি দ্বারা সেই ধূমায়মান প্রেম কিঞ্চিৎ সন্ধুক্ষিত হইল। নগেন্দ্রকে ভালবাসেন—কুন্দ এ কথা এতদিন কাহাকেও বলেন নাই, সেই প্রেম কুন্দ এতদিন হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে নিগূহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ কমলমণি কুন্দহৃদয়ের সেই গূঢ়তম প্রদেশ হইতে সেই কথা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই দাদাকে বড় ভালবাসিস্।—না?"। সহসা এই প্রশ্নে কুন্দের হৃদয় ভাববেগে উচ্ছ্বসিত হইল; কুন্দ কমলের হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না। আজ এ প্রশ্নে কুন্দের হতাশাপীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল, কুন্দের মনে হইল—নগেন্দ্র তাঁহায় ভাল বাসেন, তাই কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসে কি না জানিবার জন্যই আজ কমলমণির এই প্রশ্ন। এই জন্য কুন্দনন্দিনী মস্তকোত্তোলন করিয়া কমলের

প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন, বলিলেন পাড়ারমুখী চোকের মাথা খেয়েছ? দেখিতে পাও না যে দাদা কে ভালবাসে?"

এ আশাতীত সংবাদ আজ কুন্দের ভগ্নাশ হৃদয়ের পক্ষে আত্মঘ বান্ হইল। বাতাহত তরুশিরের ন্যায় ঘুরিয়া কুন্দের মৌ উন্ন ক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রু ল কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে দিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল।' কমল যে প্রশ্ন রয়াছিলেন, কুন্দের নীরব ক্রন্দনে তাহার পূর্ণ উত্তর পাইলেন। দিক্ যায় দেখিয়া কুন্দকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য গ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কুন্দ অনেক ভাবিয়া অসম্মতি লেন বাব। 'কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণম ণ বলি দিল।' কুন্দ আপনার মঙ্গল একবার ভাবিলেন না, কারণ নন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।' 'দাদা তোকে ভাল স'—কমলের এই কথা কুন্দের হৃদয় আলোড়িত করিল। এতদিন নগেন্দ্রকে শুদ্ধ ভালবাসিয়াই সুখিনী ছিলেন। তিনি এতদিন াশ প্রণয়ের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ ছিলেন। ভালবাসার প্রত্যর্পণ পাইবার শা তাঁহার মনে একবারও উদিত হয় নাই। নগেন্দ্রকে শুদ্ধ দেখি- ই জীবন অতিবাহিত করাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। নগেন্দ্র তাঁহার তে পারেন এ ভাব কেবল তাঁহার মনে আজ উদিত হইল। কিন্তু বার অদৃষ্টের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিল। তিনি কাতর হইয়া একদিন াবে নগেন্দ্রের উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া এই ভাবিতে লাগি- ন "ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত? লে নক্ষত্র হব—তা হলে—হব ত! দেখিতে পাব—রোজ রোজ খিতে পাব—কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারিনে কি? আচ্ছা নাম আনিতে পারিনে কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে । একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। -নগ—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র,

নগেন্দ্র আমার নগেন্দ্র! আ মলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্য-মুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হলেম কি? আচ্ছা—সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক—ডুবেই মরি। আচ্ছা যেন এখন ডুবিলাম—কাল্ ভেসে উঠ্‌বো—তবে সবাই শুনবে, শুনে নগেন্দ্র—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র—আবার বলি—নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র! নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন, ত বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব—কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব কি? পারি—কিন্তু আজি না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভালবাসেন। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য! কমল দিদি ত বলিল—কিন্তু কমল জানিল কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভাল বাসেন? কিসে ভাল বাসেন? কি দেখে ভাল বাসেন, রূপ না গুণ? রূপ—দেখি?—দূর হউক গা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্য্যমুখী সুন্দর, আমার চেয়ে হেমমণি সুন্দর; বিশু সুন্দর; মুক্ত সুন্দর; চন্দ্র সুন্দর; প্রসন্ন সুন্দর; বামা সুন্দর; প্রমদা সুন্দর; আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দর; হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ; শ্যামবর্ণ হলে কি হয়—মুখ আমার চেয়ে সুন্দর। তা রূপ ত গোল্লাই গেল—গুণ কি? আচ্ছা দেখি দেখি ভেবে।—কই, মনে ত হয় না। কমলের মন রাখা কথা—আমায় কেন ভালবাসি-বেন? তা, কমল মন রাখা কথা বল্‌বে কেন? কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! ত মিছে কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য বলিয়া ভাবিব। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারিব না। দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পার্‌ব না পার্‌ব না—পার্‌ব না। তা না গিয়েই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাদের ত অসুখী করিতেছি। সূর্য্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে, বুঝিতে পারি। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তবে

ডুবে মরি। মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে ;"—

এই টুকুর মধ্যে কুন্দের হৃদয়ে কত বিপরীত তরঙ্গ উত্থিত হইল —কমলের কথা একবার সত্য বলিয়া বোধ হইল, আবার তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। একবার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বলবতী হওয়ায় কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল, আবার নগেন্দ্রের অদর্শন জনিত যাতনা মনে হইল—আবার সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। যখন কৃতজ্ঞতা ও নগেন্দ্রপ্রেম উভয়ই প্রবল হইয়া উঠিল, তখন ডুবিয়া মরাই স্থির হইল। কুন্দ যখন এই শেষ সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন নগেন্দ্র পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে ধীরে কুন্দের পৃষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন। কুন্দ তাঁহাকে চিনিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ! কালি কলিকাতায় যাইবে?" কুন্দ উত্তর দিলেন না—কেবল চক্ষু মুছিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ! ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ?" কুন্দ আবার চক্ষু মুছিলেন—কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি বলিলেন "কুন্দ! কাঁদিতেছ কেন?" এবার কুন্দের হৃদয় ফাটিল—তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি এতদিন নগেন্দ্রের নিকট আত্মগোপন করিয়া আসিয়াছিলেন, আজ নির্ব্বাক্ রোদনে তাঁহার হৃদয়দ্বার নগেন্দ্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। এই বিশ্বাসের প্রত্যর্পণ জন্যই যেন নগেন্দ্র আজ কুন্দের নিকট আপনার হৃদয় খুলিলেন। নগেন্দ্রের হৃদয়ের সমস্থিতি আজ বিনষ্ট হইল, কিন্তু কুন্দ রোদন সম্বরণ করিয়া আবার চিত্তজয়ে কৃতকার্য্য হইলেন। আজ বালিকার নিকট মনীষী পরাজিত হইলেন। আজ নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, কিন্তু কুন্দ বলিলেন "না।"

তাহার পর একদিন সূর্য্যমুখীর তিরস্কারে কুন্দ রজনীযোগে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। সূর্য্যমুখী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুন্দ-পতঙ্গ নগেন্দ্র-বহ্নি পরিত্যাগ করিয়া অধিকদূর যাইতে পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নগেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে আসিয়া বসিল।

কুন্দের যাইবার দিন নগেন্দ্র যে সার্সী খুলিয়া আলোকপটে প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্ত্তি কুন্দকে দেখাইয়াছিলেন; আবার যে সার্সী বন্ধ করিয়া নগেন্দ্র সরিয়া গেলে কুন্দ মনে মনে বলিয়াছিলেন 'নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও—শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মরে মরুক। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই'—আজ তিনি নগেন্দ্রের উদ্যানে আসিয়া সেই সার্সীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মানস নগেন্দ্র উঠিয়া বাতায়ন-সমীপে দাঁড়াইলে তাঁহাকে দেখিয়াই ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু আজ অভাগিনীর সে মনোরথ পূর্ণ হইল না। তিনি নগেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু পুষ্পচয়ন-ব্যগ্রা সূর্য্যমুখীর নয়নপথে পতিত হইলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। সূর্য্যমুখী এবার নিজে উত্তর-সাধক হইয়া নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহ দিয়া নিজে নিরুদ্দেশ হইলেন। অভাগিনীর সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

কুন্দ আজ আশাতীত সুখের অধিকারিণী হইয়াও অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন—মনে ভাবিলেন "সূর্য্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজ সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।"

নিজ স্বার্থের সহিত পর স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কুন্দ পর-স্বার্থের নিকট নিজ স্বার্থ বলিদান করিতেন। যে দিন প্রথম নগেন্দ্র সেই বাপীতটে প্রাণ খুলিয়া প্রণয়-পূরিত বাক্যে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি উপকর্ত্রীর দুঃখ ভাবিয়া চিত্তসংযম করিয়া বলিয়াছিলেন "না।" কিন্তু যখন সূর্য্যমুখী স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন, তখন উপকর্ত্রীকে অসুখিনী করিব বলিয়া কুন্দের কোন আশঙ্কা হয় নাই। সূর্য্যমুখীর তাৎকালিক ভাবভাব—ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশান্তভাব—চিরসহচর নগেন্দ্রই বুঝিতে পারেন নাই, সরলা বুঝিবে কিরূপে? তিনি নগেন্দ্রকে

তদ্ধ দেখিয়াই জীবন কাটাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, নগেন্দ্রের পত্নী হইবেন সে আশা তিনি একদিনও করেন নাই। তিনি নগেন্দ্রেরই, কিন্তু নগেন্দ্র যে তাঁহার--তিনি একদিনও তাহা ভাবিতে সাহস করেন নাই। কেবল সেই দিন মাত্র প্রদোষকালে বাপীতটে বসিয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন "আমার নগেন্দ্র।" কমলমণির মুখে "দাদা তোকে ভাল বাসে" এই কথা শোনার পরই তাঁহার এরূপ সাহস হইয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের, অমনি বলিয়া উঠিলেন "আমলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র।" কিন্তু আজ তাঁহার সে দুরাশাও পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি কুন্দ দুঃখিনী। কুন্দ যে সুখ অনন্ত অসীম ও অপরিমিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সে সুখে পদার্পণ করিতে না করিতেই তাহার সীমা অবধি ও পরিমাণ দেখিলেন। যাঁহাকে লইয়া তাঁহার সুখ তিনি আজ সূর্য্যমুখী-বিরহে নিরতিশয় কাতর।

সূর্য্যমুখীর পলায়নের পরদিন প্রদোষে নগেন্দ্রকে ব্যজন করিতেছেন, আর কেহ নাই—অথচ দুইজনেই নীরব। কুন্দ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া আজ মুখ ফুটিয়া নগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিলে, আবার যেমন ছিল, তেমনই হয়?" নগেন্দ্র সন্দেহ করিলেন যে কুন্দ বিবাহজন্য অনুতাপিনী। কুন্দ ইহাতে ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ—তাহা আমি কখন আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না—আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে, সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে"। নগেন্দ্র--সূর্য্যমুখীর নাম গ্রহণে কুন্দের অধিকার নাই—কুন্দকে এইরূপ তিরস্কার করায় কুন্দ কাতর হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, "এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমিত কোন দোষ করি নাই। সূর্য্যমুখীইত এ বিবাহ দিয়াছে।" আমরাও বলি কুন্দত কোন দোষ করেন নাই। বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই,

আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত। তাকে 'আকাশের চাঁদ হাতে দিল কে?' বস্তুতঃ সূর্য্যমুখীই কুন্দকে এই আশাতীত সুখিনী করিয়াছিলেন। তিনি অনাথিনীকে স্বয়ং সুখিনী আজ দুঃখ-পারাবারে ভাসাইয়া গেলেন, কিন্তু সে দোষ তাঁহার ন নগেন্দ্রের। নগেন্দ্র কুন্দ-নন্দিনীকে বিবাহ করিয়াও যদি সূর্য্যমু পায়ে না ঠেলিতেন—যদি সূর্য্যমুখীর অলৌকিক ঔদার্য্য ও অতি স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন—তাহা "বিষবৃক্ষ" অঙ্কুরে বিদলিত হইত, গোবিন্দপুর স্বর্গধাম হইত, সুখী ও কুন্দনন্দিনী উভয়েই নগেন্দ্র-দেবের সেবায় নিরত পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না। ভবিতব্যের দ্বার কে করে? কুন্দকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র ভাবিলেন রাগ করিয়াছেন। রাগ করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "না"। নগেন্দ্র ছোট্টো "না" কথাটী ঔদাসীন্য ও ভালবাসার অভাবের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিলেন। ভাল বাস না জিজ্ঞাসা করায় কুন্দ বলিলেন "বাসি বইকি?" এই সরল অকৃত্রিম প্রণয়খ্যাপনে নগেন্দ্র বিরক্ত হইলেন। যে নগেন্দ্র— মুখীর—"আমার সর্ব্বস্বধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার প্রাণ দিতে পারি" "তুমি আমার পরকাল" ইত্যাদি অসংখ্য হৃ দ্রাবক প্রেমখ্যাপনা শুনিয়াছেন, তিনি আজ সরলার এই সং প্রণয়েতিহাসে কেন পরিতৃপ্ত হইবেন? নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করি "কুন্দ! বোধ হয় তুমি আমায় কখন ভাল বাসিতে না।" কুন্দ আ সরলভাবে উত্তর দিলেন "বরাবর বাসি।"

'নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে এ সূর্য্যমুখী নয়। সূর্য্যমু ভাল বাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না—তাহা নহে—কিন্তু কুন্দ জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরু-স্বভাব, কথা জানেন না, আর বলিবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না'। এই কথা না জান কুন্দের ধ্বংসের মূল হইল, কুন্দ নগেন্দ্রপত্নী হইয়া অধিক দিন নগে প্রণয়িনী থাকিতে পারিলেন না। যতদিন দুরত্বজনিত মোহ ছিল

ততদিন কুন্দ নগেন্দ্র-প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন, বিবাহ হইলে সে দূরত্ব গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সে মোহও অপনীত হইল। নগেন্দ্রের নিকট কুন্দ সূর্য্যমুখীর সহিত তুলনার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন না। কুন্দ এখন নগেন্দ্রের চক্ষুঃশূল হইলেন। নগেন্দ্র কুন্দকে ফেলিয়া সূর্য্যমুখীর অন্বেষণে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন।

'কুন্দনন্দিনী ভগ্ন পুতুলের ন্যায়, নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃত পুরীমধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন।'

নগেন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে দেওয়ানকে পত্রাদি লিখিতেন—কিন্তু অভাগিনী কুন্দকে একখানি পত্র লিখিতেন না। কুন্দ দাওয়ানের কাছে সেই গুলি চাহিয়া আনিয়া পড়িতেন, পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিতেন না। সেই গুলির পাঠ তাঁহার গায়ত্রীজপ হইয়াছিল। সেই বিপুল পুরীমধ্যে একাকিনী কুন্দ নগেন্দ্রবিরহে যে কি যাতনা পাইতেছিলেন তাহা কে জানিবে? নগেন্দ্রের অনাদরে সূর্য্যমুখীর যে যাতনা হইয়াছিল, কুন্দের এ যাতনা তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও ন্যূন ছিল না।

'সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা কুন্দের নিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত সে হৃদয়ে আঘাত করিত।' কুন্দ রাত্রিদিন ভাবিতেন—সূর্য্যমুখী আকাশের চাঁদ হাতে দিয়া কি দোষে তাহা কাড়িয়া লইলেন? কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? ভাল নগেন্দ্র নাই ভাল বাসুন—তাঁকে ভাল বাসিবেন কুন্দের এমন কি ভাগ্য—একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন কুন্দই এই বিপত্তির মূল; সকলেই ভাবে কুন্দই অনর্থের মূল।' কিন্তু অভাগিনী কুন্দ বুঝিয়া স্থির করিতে পারিতেন না কি দোষে তিনি সকল অনর্থের মূল, বুঝিতে না পারিয়া কেবল দিন রাত্রি রোদন করিতেন।

আবার কখন কখন কুন্দ সমস্ত দোষ নিজ মস্তকে লইতেন, ভাবিতেন "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমা হ'তে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিত—তাহাকে

পথের কাঙ্গালিনী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে
আমি মরিলাম না কেন? এখনও মরি না কেন?” অমনি নগেন্দ্রে
দেবমূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিপটে প্রতিবিম্বিত হইত—অমনি নগেন্দ্র-দর্শ
লালসা প্রদীপ্ত হইত—আবার ভাবিতেন, “এখন মরিব না। তি
আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি—তিনি কি আর আসিবেন না?
নগেন্দ্রদর্শনই কুন্দের স্বর্গ—নগেন্দ্রদর্শন ভিন্ন কুন্দ আর কো
সৌভাগ্যেরই প্রার্থিনী নহেন। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিবে
নগেন্দ্রকে দেখিয়া, সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে প্রত্যর্পণ করি
মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না’—কুন্দ অবশেষে তাহ
স্থির করিলেন।

নগেন্দ্র বাটী আসিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই রাত্রিতে
সূর্য্যমুখী দেখা দিলেন। ‘বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষ
করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে, উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সম
রাত্রি রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকে বাল্যকালে অকপটে আ
সমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল, সেখানে তাহার বি
মধ্যে কেবল তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই এ রোদনে
মর্ম্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে।’ নগেন্দ্রের অনাদরে কুন্দের পরিতা
জন্মিল, কুন্দ ভাবিলেন, “কেন আমি স্বামিদর্শন-লালসায় প্রাণ রাখিয়
ছিলাম? এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?” কুন্দ এইর
চিন্তায় সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় ও রোদনে যাপিত করিলেন। প্রত্যু
হীরা আসিয়া দেখিল ‘কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিশ ভিজিয়াছে’
হীরা জিজ্ঞাসা করিল, “এ কি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ না কি? কে
বাবু কিছু বলেছেন?” কুন্দ বলিলেন “কিছু না”। এই বলিয়া কু
আবার দ্বিগুণিত বেগে কাঁদিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র আসিয়া তাঁহা
সহিত কি কথা বার্ত্তা কহিলেন হীরা তাহা জানিতে চাহিল। কু
বলিলেন, “কেন? কথা বার্ত্তা বলেন নাই।” হীরা বলিল “সে কি গা
এত দিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলিলেন না?” কুন্দ বলি
লেন, “আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।” এই শেষ কথা বলিতে কুন্দে

হৃদয় ফাটিয়া গেল, উচ্ছলিত শোকবেগে কুন্দ কাঁদিয়া ফেলিলেন। হীরা হাসিয়া বলিল, "ছি মা! এতে কি কাঁদতে হয়? কত লোকের বড় বড় দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল—আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্ব জন্য কাঁদিতেছ!"। ইহা অপেক্ষা "বড় বড় দুঃখ" আর কি হইতে পারে কুন্দ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। হীরা বলিল, "আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এত দিন তুমি আত্মহত্যা করিতে"।

"আত্মহত্যা" এই অশুভসূচক ধ্বনি কুন্দের কর্ণ-কুহরে বজ্রধ্বনির ন্যায় বাজিয়া উঠিল। কুন্দ সে আঘাতে শিহরিয়া উঠিলেন। কে যেন তাঁহার কাণে কাণে আসিয়া বলিল "তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে? এ যন্ত্রণা সহা ভাল, না মরা ভাল?" ভূতাবিষ্টার ন্যায় কুন্দ কিরূপে আত্মঘাতিনী হইবেন কেবল এই ভাবনায় নিমগ্ন হইলেন। সুবিধাও জুটিয়া গেল। হীরা যে বিষের কৌটা ফেলিয়া গিয়াছিল, কুন্দ তাহা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিয়া বিষপান করিলেন।

সূর্য্যমুখী কমলকে সঙ্গে করিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কুন্দের ঘরে প্রবেশ করিয়া কুন্দের অবস্থা দেখিয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে কমল ভয়বিকৃত বদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইয়া নগেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে তাঁহাকে কুন্দের ঘরে যাইতে বলিলেন। নগেন্দ্র তথায় গিয়া দেখিলেন সূর্য্যমুখী কাঁদিতেছেন।

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?"। সূর্য্যমুখী বলিলেন "সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" নগেন্দ্র ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 'কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু হীনতেজ হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে'।

আজ এই শেষ দিনে অনাথিনীর সাহস বাড়িল—আজ প্রথম ও শেষ দিনে দুঃখিনী কুন্দ হৃদয়-নিগূহিত গভীর প্রেম বাক্য ও কার্য্যে প্রকাশ করিলেন, নগেন্দ্র নিকটে আসিলে অশ্রুজল দরবিগলিত ধারায় তাঁহার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ছিন্নমূল লতার

লায় নগেন্দ্রচরণে লুণ্ঠিতশির হইলেন। নগেন্দ্র স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন, "এ কি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ নগেন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন, তিনি আপনাকে নগেন্দ্রের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিবার যোগ্যা বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু আজ কুন্দ শেষ দিনে নির্মুক্তভাবে তাঁহার কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। কুন্দ-কুসুম শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে ক্ষণেকের জন্য ঈষৎ প্রস্ফুটিত হইল। কুন্দ বলিলেন "তুমি কি দোষে আমায় ত্যাগ করিয়াছ?"

নগেন্দ্র অবাক্ হইয়া নতশিরে কুন্দের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কুন্দ তখন আবার বলিলেন, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমন করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে, তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না"।

এই প্রেমপূরিত হৃদয়-বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া নগেন্দ্র নীরবে স্থাণুর ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। নগেন্দ্রের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। আজ কুন্দ সূর্য্যমুখী অপেক্ষাও বাক্‌পটু। আজ কুন্দের প্রেম আধার-স্বরূপ হৃদয় ভস্মসাৎ করিয়া বাহিরে জ্বলিয়া উঠিল। প্রভাত বিকাশের ন্যায় ইহা আজ জগৎ আলোকিত করিল। কুন্দ বলিলেন "ছি! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসি-মুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম, তবে আমার মরণেও সুখ নাই"।

পতিপ্রেমের ইহা অপেক্ষা প্রবলতর দৃষ্টান্ত সূর্য্যমুখীও দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আজ এ প্রেমখ্যাপনে কুন্দের কি লাভ? আজ লাভ নাই বলিয়াই আজ কুন্দ সাহসিনী—স্বার্থসাধনের সন্দেহ আসিবে না বলিয়াই আজ কুন্দ নগেন্দ্রের সম্মুখে হৃদয় খুলিলেন। ভালবাসা দেখাইলে নগেন্দ্র ভাল বাসিবেন—এ আশার সহিত ত

কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই আজ কুন্দ এত নির্মুক্ত ভাবে নগেন্দ্রকে ভাল বাসা দেখাইলেন।

নগেন্দ্র এতদিন কুন্দের প্রেমের গভীরতা ও নিঃস্বার্থতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজ শেষ দিনে উপলব্ধি করিয়া মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ সৌদামিনী-বিলসনের ন্যায় মৃদু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম তাহা কেবল মনের বেগে বলি নাছি। তোমার আসিবার আগেই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন্দ্রকে দেখিলে কুন্দের মরিতে ইচ্ছা হয় না—এই টুকুতেই কুন্দের প্রেমের মাহাত্ম্য। নগেন্দ্রদর্শনেই কুন্দের পরিতৃপ্তি। নগেন্দ্র-ভোগলালসা কুন্দকে কখনই পার্থিব করিয়া তুলিতে পারে নাই। নগেন্দ্র আজ কুন্দের সেই অপার্থিব প্রেমের নিকট পরাজিত হইলেন। আজ নগেন্দ্র চিরমুগ্ধা বালিকার বাক্যগাম্ভীর্য্যে ও বাক্য-মাহাত্ম্যে পরাস্ত হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল বিশ্রামের পর আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখন মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে—জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া কুন্দ পর্য্যঙ্কাবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া, ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া মুদিত-নয়ন ও নীরব হইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া কুন্দ সূর্য্যমুখী ও কমলকে দেখিতে

চাহিলেন। তাঁহারা আসিলে কুন্দ তাঁহাদিগের চরণ-রেণু মস্ত
গ্রহণ করিয়া স্বামীর চরণযুগল-মধ্যে মুখ লুকাইলেন। ক্রমে কু
বিগতচেতনা হইয়া, স্বামীর পদযুগল-মধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন বয়
কুন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কুন্দ-কুসুম মুহূর্তমাত্র ঈষৎ বিকসিত হইয়া জন্মের মত শুকাই
গেল; সেই ঈষদ্বিকসনের সৌন্দর্য্যে—সেই অনতিপরিস্ফুট কে
কর সৌগন্ধ্যে—সহৃদয় পাঠকবর্গের মানসক্ষেত্র আজও সমুজ্জ্বা
ও সুরভিত হইয়া রহিয়াছে। চিরদুঃখিনী অনাথিনী নিরপরাধি
নগেন্দ্রময়জীবিতা কুন্দের দুঃখে—কুন্দের মৃত্যুতে পাষাণেরও হৃ
সহানুভূতি উদ্দীপিত হয়, রক্তমাংসনির্ম্মিত মানবের হৃদয়ে যে সহা
ভূতি উদ্দীপিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কুন্দের দুঃখ
কুন্দের মৃত্যু সংঘটিত না হইলে "বিষবৃক্ষের" হৃদয়দ্রাবণী শক্তির অ
বিনষ্ট হইত।

কমলমণি।

যেমন সূর্য্যালোক বিনা সৌধরাজি-বিভাসিত নগরনগরী-পূ
জগৎ আঁধার, যেমন দীপালোক বিনা রত্নরাজি-খচিত কারুকার্য্য-বি
শিষ্ট স্ফটিক-নির্ম্মিত গৃহেরও শোভা হয় না, সেইরূপ কমলমণি
থাকিলে এই বিচিত্র-চিত্রনিচয়-খচিত "বিষবৃক্ষ"ও তমসাচ্ছন্ন হই
চন্দ্রকিরণ যেমন হাঁসিয়া হাঁসিয়া দরিদ্রের কুটীর হইতে রাজপ্রা
পর্য্যন্ত সমস্ত আলোকিত করে, কমলের হৃদয়-জ্যোৎস্নাও সেই
দীন দুঃখীর অন্তর হইতে ধনীর অন্তর পর্য্যন্ত সকলই উজ্জ্বা
করিত।

কমলের জীবনে কোন অভাব ছিল না। ধনবান্ ও গুণ
ভ্রাতা, ঐশ্বর্য্যশালী ও তদায়ত্ত-প্রাণ স্বামী এবং দাম্পত্যগ্রন্থি প্র
থিক পুত্র—কমলের এ সমস্তই ছিল। সংসারিণী যে সকল সুখ
প্রার্থিনী, কমল সে সমস্ত সুখেরই অধিকারিণী ছিলেন। কম

নিজের অভাব, নিজের দুঃখ ছিল না বলিয়াই, কমল পরের অভাবে, পরের দুঃখে এত সহানুভূতি করিতেন। যে নিজের অভাবে, নিজের দুঃখে অভিভূত, সে পরের অভাবে ও পরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অবসর ও সুবিধা পায় না। যাহার নিজের অভাব ও দুঃখ নাই, সে যদি দয়া ও স্নেহের আধার হয়, সে যত অপরের অভাব ও দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবে, অপরে তাহা পারিবে না। কমলের নিজের কোন অভাব ও দুঃখ ছিল না, এবং তাঁহার হৃদয় অপরিমিত দয়া ও স্নেহের আধার ছিল এই জন্য কমল সকলেরই শান্তিদায়িনী ছিলেন। নগেন্দ্রের বিশ্বপ্রেমিকতা ও ঔদার্য্য কমলেও অনেক পরিমাণে ছিল। এইজন্য কমল আপন পর বড় বিবেচনা করিতেন না। কমল শ্রীশের, কমল নগেন্দ্রের, কমল সতীশের, কমল সূর্য্যমুখীর, কমল কুন্দের, কমল দাস দাসী প্রভৃতি সকলেরই। কমল যাহারই সংমিশ্রণে আসিতেন, তাহারই সুখে ও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন। সংঘর্ষ পায় নাই বলিয়া কমলের দয়া, কমলের স্নেহ, কমলের বিশ্বপ্রেমিকতা, কমলের ঔদার্য্য কখনই অভ্রভেদী উৎকর্ষ শিখরে আরোহণ করে নাই বটে; কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় আবার নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশেও কখন অবনমিত হয় নাই। সেই সকল কোমলতর বৃত্তিনিচয় কমলের হৃদয়াকাশে বাসন্ত মলয়ানিলের ন্যায় সতত মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইত। কমলের কোমলতর বৃত্তিনিচয়ের সেই মৃদুমন্দ প্রবাহে যেই পতিত হইত, তাহারই শোক তাপ ও অভাব দুঃখ দূর হইত। হাস্যময়ী যে দিকে একবার তাকাইতেন, অন্ধকার সে দিক্ হইতে পলায়ন করিত। আনন্দময়ী যেখানে যাইতেন, সেই খানেই যেন আনন্দ ছড়াইয়া পড়িত। রসিকতা, সহৃদয়তা ও গাম্ভীর্য্যের এরূপ সংমিশ্রণ অতি অল্পই দেখা যায়। কমলমণির পতিপ্রেম নিতান্ত সাধারণ ছিল না। তবে সূর্য্যমুখী ও কুন্দের পতিপ্রেম বাধা পাইয়া যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছিল এবং ভক্তির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যেরূপ স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল, কমলের প্রেম সেরূপ পরিপুষ্ট ও স্বর্গীয়-ভাব-পূর্ণ হয় নাই।

প্রকৃতি যেমন কমলকে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সকল প্র সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন, কমলের পিতাও তাঁহাকে আ শোভায় শোভিত করিতে যত্নের ক্রটী করেন নাই। পিতার ি যত্নে কমল রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কমল পিতার স একমাত্র কন্যা ছিলেন বলিয়া কিঞ্চিৎ আদরিণী ছিলেন। যৌ এ আদরিণী-ভাব তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। এই আদরিণী-ভ সহিত যৌবনে বালিকাসুলভ চপলতা ও সরলতা সংমিশ্রিত হ কমলচরিত্র অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। কমল সব সহিতই হাস্য কৌতুক করিতেন; বালিকার নির্ব্বিকার হাস্য কৌ যেমন সকলেই আনন্দিত হয়, সেইরূপ কমলের হাস্য কৌতুকে লেই প্রীত হইতেন। সংসারানভিজ্ঞের সরলতা ও ঘোরতর সং বুদ্ধিপ্রখরতা—কমলে এই দুই বিরুদ্ধ ভাব অতি সুন্দররূপে সংমি ছিল।

নগেন্দ্র অপরিচিত বালিকা কুন্দকে কমলের হস্তে সমর্পণ কর যেই পশ্চাৎ ফিরিলেন, অমনি 'কমল কুন্দকে কোলে তুলিয়া ল দৌড়িলেন। একটা টবে কতকটা অনতিতপ্ত জল ছিল, অক কুন্দকে তাহার ভিতর ফেলিলেন। কুন্দ মহাভীতা হইল। ক তখন হাসিতে হাসিতে স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ হস্তে লইয়া স্বয়ং তাহ গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন।' 'কমল স্বহস্তে কুন্দকে মার্জি এবং স্নাত' করাইয়া 'তাহাকে অমল শ্বেত চারু বস্ত্র পরাইয়া, গ তৈল সহিত তাহার কেশরচনা করিয়া দিলেন; এবং কতকগুলি অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "যা, এখন দাদা বাবুকে প্রণ করিয়া আয়। আর দেখিস্—যেন এবাড়ীর বাবুকে প্রণাম ক ফেলিস্ না—এবাড়ীর বাবু দেখিলেই বিয়ে করে ফেলিবে।" এই কমলের কৌতুকপ্রিয়তা ও সহৃদয়তার কেমন সুন্দর ছবি!

সূর্য্যমুখী যখন নগেন্দ্রের হৃদয় কুন্দাসক্ত বলিয়া সন্দেহ করি কমলের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন, কমল তখন তাহ প্রত্যুত্তরে এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—

"তুমি পাগল হইয়াছ। নহেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না, আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

সতীর আদর্শ সূর্য্যমুখীও এখানে পতিভক্তিতে কমলের নিকট পরাস্ত হইলেন। কমল স্বামীর হৃদয়কে অবিশ্বাস করাও স্ত্রীলোকের পক্ষে পাপ বলিয়া মনে করিতেন।

শৃঙ্গাররসের তিনটী ভাগ—পূর্ব্বরাগ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। পূর্ব্বরাগ ও বিপ্রলম্ভেই হৃদয়ের মহতী বৃত্তি নিচয় উদ্দীপিত ও পরিপুষ্ট হয়। ভবভূতির সীতায় শুদ্ধ বিপ্রলম্ভ; কালিদাসের শকুন্তলায় পূর্ব্বরাগ, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ; বঙ্কিমের সূর্য্যমুখীতে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ, কুন্দে পূর্ব্বরাগ ও বিপ্রলম্ভ, কমলমণিতে শুদ্ধ সম্ভোগ—চিত্রিত হইয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা রমণীর পূর্ণ চিত্র বটে—রমণীসুলভ তিন অবস্থায় রমণীমনের কিরূপ বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়, তাহার ছবি প্রকাশ করায় কালিদাসের শকুন্তলা সর্জনশীল কবিত্বের অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ থাকিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভবভূতির সীতা ও বঙ্কিমের সূর্য্যমুখী ও কুন্দের ন্যায় কখন এতদূর হৃদয়দ্রাবণী হইবে না। কুন্দ ও সূর্য্যমুখীর মধ্যে কুন্দ আবার সূর্য্যমুখী অপেক্ষাও অধিকতর হৃদয়দ্রাবণী, কারণ সূর্য্যমুখীর প্রেম সম্ভোগপর্য্যবসায়ী, কিন্তু কুন্দের প্রেম চির-বিপ্রলম্ভ-পর্য্যবসায়ী। কমলের প্রেমের উন্মাদকী শক্তি আছে বটে, কিন্তু হৃদয়দ্রাবণী শক্তি কিছুই নাই; যে হেতু তাহা আমূলসম্ভোগাত্মক। ইহাতে স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস নাই বটে, কিন্তু তাহা পার্থিবসুখহিল্লোলে ঈষন্নর্ত্তনশীল। 'মহাসমর' নামক পরিচ্ছেদে এই প্রেমের ছবি অতি সুন্দর প্রদত্ত হইয়াছে।

কমল সূর্য্যমুখীর পত্র পাইয়া যখন গোবিন্দপুরে গমন করিলেন, তখন তিনি সূর্য্যমুখী ও কুন্দ উভয়েরই প্রতি অতি চমৎকার ব্যবহার

করিলেন। তাঁহার আগমনেই নগেন্দ্রের গৃহ আলোকিত হইল, তাঁহার সহাস্য বদন দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও নয়ন-জল শুকাইল। নগেন্দ্রের মেঘাচ্ছন্ন মুখমণ্ডলেও কমলের হৃদয়-জ্যোৎস্না প্রতিবিম্বিত হইল। কমল সূর্য্যমুখীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া—কুন্দেরও দুঃখে কাতর হইয়া পড়িলেন। সূর্য্যমুখীর কণ্টকোদ্ধার করিতে গিয়া, সে কণ্টক যত্ন করিয়া নিজের হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন। কুন্দ যখন কমলের নিকট ছিলেন, কমলের চিরপ্রেমময়ী প্রকৃতি তখন হইতেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক কতক কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে 'কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা আবার নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।'

কুন্দের সহিত কমলের প্রথম সম্ভাষণ এইরূপ হইল "ওলো কুঁদী মুদী দুঁদী—ভাল আছিস ত কুঁদি?" কুন্দ অবাক্ হইয়া রহিলেন। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর স্থির করিয়া বলিলেন "আছি।" কমল বলিলেন 'আছি দিদি, আমায় দিদি বল্‌বি—না বলিস্ ত ঘুমিয়া থাকিবি আর তোর চুলে আগুণ ধরিয়ে দিব। আর নহিলে গায়ে আরসুলে ছাড়িয়া দিব।"

কমল কুন্দের চুল বাঁধিতে বসিলেন। 'চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঁদি, কাঁদিতেছিলি কেন?"

কুন্দ বলিল, "তুমি যাবে কেন?"

'কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু ফোটা দুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল।

'কমলমণি বলিলেন, "তাতে কাঁদিস্ কেন?"

'কুন্দ। তুমিই আমায় ভাল বাস।

কম। "কেন—আর কেহ কি ভাল বাসে না?" "কে ভাল বাসে না? বউ ভাল বাসে না—না দাদা ভাল বাসে না?"

কিছুতেই কুন্দের উত্তর নাই। কমল আবার বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভাল বাসি—আর তুমি আমায় ভাল বাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?" কুন্দ এবারও নিরুত্তরে। কমল নাছোড়, আবার বলিলেন—"যাবে?" এবার কুন্দের ঘাড় নড়িল বলিল—"যাব না।"

চতুরা কমল কুন্দের হৃদয় বুঝিলেন, তথাপি কুন্দের মুখ হইতে তাহার মনের কথা বাহির করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তাকে বড় ভাল বাসিস—না?"

কুন্দ নীরবে কমলের হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল। ভাল বাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে, কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইত। "কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছিয়া কহিল, "কুন্দ! আমার সঙ্গে চল।" কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল, নহিলে তুই বয়ে গেলি, দাদা বয়ে গেল, বউ বয়ে গেল—সোণার সংসার ছারখার গেল।" কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, যাবি? মনে করিয়া দেখ্—দাদা কি হয়েছে, বউ কি হয়েছে?" প্রেমময়ীর দয়ার্দ্র ভাবের এখানি রমণীয় ছবি।

কমল এক মুহূর্ত্ত শ্রীশের বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীশ আফিসে গেলে কমলের সে টুকুও পতিবিরহিণী হইয়া গৃহে থাকা কষ্টকর বোধ হইত। কমল একদিন সতীশের কাছে এই বিরহাসহিষ্ণুতা কেমন সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতেছেন দেখুনঃ—

"অ, সতুবাবু, মানুষে আপিসে যায় কেন, বলিতে পার?" সতুবাবু উত্তর দিলেন, "ইলি—লি—বিলি—"।

ক। "সতুবাবু তুমি কখন আপিসে যেও না।

সতু বলিল "হাম্"।

কমলমণি বলিলেন, "তোমার হাম্ করবার ভাবনা কি? আমাকে হাম্ করার জন্ত আপিসে যেতে হবে না। আপিসে যেওনা—আপিসে গেলে বৌ দুপর বেলা বসে বসে কাঁদিবে।"

কমলের বুদ্ধির নিকট শ্রীশের বুদ্ধি পরাজিত হইত। শ্রীশ অপেক্ষা যে কমল অধিকতর লোকচরিত্র-রহস্যোদ্ভেদসমর্থ ছিলেন, নিম্নে প্রদত্ত চিত্রে তাহা পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে—

সূর্য্যমুখী স্বয়ং নগেন্দ্রের সহিত কুন্দের বিবাহ দিবেন এইরূপ মর্ম্মে কমলকে একখানি পত্র লিখেন। কমল পত্রখানি শ্রীশের হাতে দিলেন, শ্রীশ পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এটা তামাসা!"

'ক। কোন্‌টা তামাসা? তোমার কথাটা না পত্রখানা?

'শ্রীশ। পত্রখানা।

'কম। আজি বন্ধিমশাইকে ডিস্‌চার্জ্জ করিব। যটে এ বুদ্ধি টুকুও নাই? মেয়ে মানুষে কি এমন তামাসা মুখে আনিতে পারে?'

কমল সূর্য্যমুখীকে একদিন শিখাইয়াছিলেন—যে পতির প্রতি অবিশ্বাসিনী হওয়া রমণীর পক্ষে ঘোরতর পাপ। আজ সূর্য্যমুখীর পত্র পাইয়া গোবিন্দপুরে গিয়া সূর্য্যমুখীকে শিখাইতেছেন যে পতি পায়ে ঠেলিলেও স্ত্রীর পতিপ্রেম বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কমল বলিলেন,—

'তোমার পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে। তবে কেন বল "আমি কে?" তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?'

কমল সূর্য্যমুখীকে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু সূর্য্যমুখীর কাতরতায় তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। 'সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায় সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে সূর্য্যমুখী কত দুঃখী।'

কমলের নির্ম্মল স্ফাটিক হৃদয়ে আপন পর সকলেরই দুঃখই প্রতিবিম্বিত হইত। সকল সময়েই কমল পরদুঃখে কাতর হইতেন। বিশেষতঃ সূর্য্যমুখীকে ও কুন্দকে তিনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। ইঁহাদের দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইতেন। একদিন মাত্র এই ভাবের

াতিক্রম দেখা গিয়াছিল। একদিন, 'প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময়, কমলমণি
াহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া
দয়াছিলেন' বলিয়া আজ কুন্দ নগেন্দ্রের তিরস্কারে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া
হৃদয়া, স্নেহময়ী কমলমণির নিকট আত্মবেদনা জানাইতে গিয়া কিছু
লিতে না পারিয়া বিবশা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 'কমলমণি কু
ন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—কুন্দকে কাছে আসিতে দেখি
র্বিত হইলেন, কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া
সিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও
রিলেন না, কি হয়েছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনা আপনি চুপ
রিলেন। কমল তখন বলিলেন, "আমার কাজ আছে," বলিয়া
ঠিয়া গেলেন।'

কিন্তু সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসম্বাদ শুনিয়া কমল যখন গোবিন্দপুরে
াসিলেন, তখন তাঁহাকে 'দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার
াকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া
য়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ
। দেখিতেন না! কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া
মলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্ল
রিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন—নগেন্দ্র আসিতেছেন, সম্বাদ
য়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন'।

সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসম্বাদে প্রথম প্রথম কমল অনেক কাঁদিয়া
লেন। তাঁহার হৃদয় শোকের অধিগম্য ছিল বটে, কিন্তু ইহা শোকে
ভিভূত হইত না। স্ত্রীসাধারণের ন্যায় তিনি শোক-বিধুরা হইয়াও
াবহিমুখা হইতেন না। তিনি পরে ভাবিলেন, "কাঁদিয়া কি করিব?
মি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন—আমি কাঁদিলেও সূর্য্যমুখী ফিরিবে
তবে কেন এদের কাঁদাই? আমি কখন সূর্য্যমুখীকে ভুলিব না;
ন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে, তবে কেন হাসব না।"

আনন্দময়ীর চরিত্রে দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব অতি অদ্ভুতরূপে
মিশ্রিত ছিল। তিনি কখন গাম্ভীর্য্যবতী প্রগল্ভা গৃহিণী, কখন

নর্ত্তনশীল চঞ্চলা বালিকা। কখন পরদুঃখকাতরা সহৃদয়া প্রৌঢ়া গৃহিণী, কখন পরসুখে আহ্লাদিনী বালিকা এহু-ই এক চরিত্র বলিয়া অনেক সময় সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমরা শেষোক্ত হৃদয়-ভাবের একটী পরিচয় নিম্নে প্রদান করিয়া এ চিত্র শেষ করিতেছি:—

সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিলে—'সকলকে বেড়িয়া বেড়িয়া কমলমণি শাঁক বাজাইতেছেন, ও হুলু ধ্বনি দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখন কখন এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া এক এক বার নৃত্য করিতেছেন।'

হীরা।

যেমন রামায়ণের ঘটনাস্রোতের মূল অভিনেত্রী মন্থরা, সেইরূপ বিষবৃক্ষের ঘটনাস্রোতের মূল অভিনেত্রী হীরা। চরিত্রের দৃঢ়তা বিষয়ে হীরা বিষবৃক্ষের সকল পাত্র পাত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হীরা সকলকেই কার্য্যে অধিনীত করিত, নিজে কাহারও দ্বারা অধিনীত হইত না। জীবনে কেবল একবারমাত্র দেবেন্দ্র দ্বারা অধিনীত হইয়াছিল। আত্মবিস্মৃতি কাহাকে বলে হীরা তাহা জানিত না; জীবনে কেবল একবার মাত্র দেবেন্দ্রের নিকট আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসা ও প্রেম—হীরার হৃদয়ে এই তিনটী বৃত্তিই অতি বলবতী ছিল। কিন্তু স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসা এ দুইটী বৃত্তি হীরার প্রেমবৃত্তির সহচরী মাত্র ছিল। প্রেম ভিন্ন হীরার আর কিছু স্বার্থ ছিল না; সেই প্রেমরূপ স্বার্থ সাধনের জন্য হীরা সহস্রলোকের স্বার্থ বলিদান করিতে প্রস্তুত ছিল; সেই স্বার্থসাধনে হতাশ হইয়া হীরা প্রতিহিংসাপরায়ণা হইয়াছিল। পতিকে বড় করার বলবতী ইচ্ছা যেমন লেডি ম্যাক্‌বেথের সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক ছিল, দেবেন্দ্রকে লাভ করার ইচ্ছা সেইরূপ হীরার সমস্ত কার্য্যের নিয়ন্ত্রী ছিল। যেমন সেই অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য লেডি ম্যাক্‌বেথ সহস্র নরহত্যা ও ভীষণ

ধাসদাতৃকতাতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সেইরূপ দেবেন্দ্র-প্রাপ্তির চরিতার্থ করিবার জন্য হীরা আশ্রয়দাত্রী সূর্যমুখীর সর্বনাশ হতে ও নিরপরাধিনী কুন্দের প্রাণবিনাশের উপায়স্বরূপ হইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

হিংসা—অন্য-শুভদ্বেষ—হীরার একটী স্বাভাবিকী বৃত্তি। ... সেই প্রবৃত্তিটী কেমন সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:—"... মুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার ... মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে ... ? তা কি হীরা জানে না কি? কেন বলবো? সূর্যমুখী সুখী, ... দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড় আমি ছোট, সে মুনিব, ... বাদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল ঈশ্বর ... কে বড় করিয়াছেন, তবে তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি ... ? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন, আমার ... দোষ কি?"

কিন্তু হীরা এই স্বাভাবিকী বৃত্তিকে সংযত করিতে জানিত; ... বিনা স্বার্থে হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিত না। তাহার জীবনের ... লক্ষ্য প্রেম—দেবেন্দ্র-লালসা। সেই দেবেন্দ্র-লালসা চরিতার্থ ... প্রধান অন্তরায় দাস্যবৃত্তি। কারণ হীরার বিশ্বাস ছিল "আমরা ... খাটিয়ে খাই; আমরাও যদি ভাল খাই, ভাল পরি, গায়ের ... মত ঘরে তোলা থাকি, তা হ'লে আমরাও অমন হতে পারি।" ...বৃত্তি ছাড়িয়া ভাল খাইলে পরিলে কুন্দের মত হইতে পারিব—... হইলে কুন্দের ন্যায় দেবেন্দ্রের প্রণয়পাত্রী হইতে পারিব—এই ... হীরা হিংসাবৃত্তিকে স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করিল; বলিল ... যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? ...নার ভাল কে না করে? তা হিসাব করিয়া দেখি, কিসে কি হয়। ...ন আমার হলো কিছু টাকার দরকার, আর দাসীপনা পারি না। ... আসিবে কোথা থেকে? দত্তবাড়ী বই আর টাকা কোথা? দত্তবাড়ীর টাকা নেবার ফিকির এই—সবাই জানে যে, কুন্দের

উপর নগেন্দ্র বাবুর চোক পড়ছে—বাবু এখন কুন্দ মন্ত্রের উপাসক। বড় মানুষ লোক, মনে করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্য্যমুখীর জন্য। যদি দুজনে একটা চটাচটি হয়, তা হলে আর বড় সূর্য্যমুখীর খাতির কর্‌বে না। এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেইটা করিতে হইবে।”

পাপিষ্ঠা হীরা এই সঙ্কল্পসাধনে কৃতকার্য্য হইল। সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রে মনান্তর বাধাইয়া দিয়া কুন্দকে নগেন্দ্রের সহিত মিলিত করিল, এবং সূর্য্যমুখীকে গৃহত্যাগিনী করিল।

দেবেন্দ্র হীরার হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হীরা শয়নে স্বপনে কেবল দেবেন্দ্রেরই ধ্যানে নিরতা ছিল। দেবেন্দ্রের জন্য হীরা উন্মাদিনী—বিবশা। দেবেন্দ্র-দর্শনের পূর্ব্বে হীরা ভাল বাসা কাহাকে বলে তাহা জানিত না, ‘ভাল বাসার কথা শুনিলে’ হাসিত। বলিত, ‘ও সব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র।’ শেষে পরের চোর ধরতে গিয়া হীরা আপনার প্রাণটা হারায়। হরিদাসী বৈষ্ণবীর সন্ধান করিতে গিয়া যে দিন দেবেন্দ্রের সহিত হীরার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন হইতেই হীরা দেবেন্দ্রগতপ্রাণা হইল। কেবল একবার হীরা ধর্ম্মভয়ে দেবেন্দ্রপ্রেম ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল—“দূর হোক্, ও সব কথা যাক্। ও পথেও ত ধর্ম্মের কাঁটা। ইহ জন্মের সুখ দুঃখ অনেককাল ঠাকুরদের দিয়াছি। * * *”

কিন্তু যে রাত্রি দেবেন্দ্র কুন্দের অনুসন্ধানে আসিয়া হীরার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন, সে রাত্রি হীরার সে ধর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে রাত্রি ‘ক্ষণকালের জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ

সমর্পণ করিয়াছে।' পরে হীরার চৈতন্য হইল। সে উন্মাদিনীর ন্যায় দেবেন্দ্রকে বলিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান"। হীরার উন্মাদিতা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া দেবেন্দ্র পরিহাস করিয়া বলিল 'একেই বলে স্ত্রীচরিত্র।' এই পরিহাসে হীরার ক্রোধানল উদ্দীপিত হইল, বলিল "স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদিগের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ, তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই—পরের ভাল মন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে কোন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড় মানুষের বউ হইলে কি হইতাম বলিতে পারি না", পরে মদনশর-সনের ন্যায় দেবেন্দ্রের ভ্রূযুগল বঙ্কিমভাবে হীরার অভিমুখে লক্ষীকৃত হইলে হীরা বিবশা হইয়া কোমলতর স্বরে দেবেন্দ্রকে বলিতে লাগিল, "প্রভো! আমি আপনার রূপ গুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখন আপনি এখান হইতে যান।"

দেবেন্দ্র ইহাতে আবার উপহাস করিলে হীরা মর্ম্মাহত হইয়া রুষ্ট ও কাতর স্বরে বলিল "আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই—আপনাকে অতি অধম লোকে ভাল বাসিলেও, তাহার ভাল বাসা লইয়া রহস্য করা কর্ত্তব্য নয়। আমি ধার্ম্মিক নহি, ধর্ম্ম বুঝি না—এবং ধর্ম্মে আমার মন নাই। তবে যে আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভাল বাসার লোভে পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি

আমাকে একটুকুও ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভাল বাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভাল বাসেন না—সেখানে কি সুখের বিনিময়ে কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার স্বাধীনতা ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন ত্যাগ করেন না, এজন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কাল আমাকে হয় ত ভুলিয়া যাইবেন; নয় ত যদি স্মরণ রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন স্থানে কেন আমি আপনার অধীন হইব? কিন্তু যে দিন আপনি আমাকে ভাল বাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণ সেবা করিব।”

এই দেবেন্দ্রময়তাই হীরার কৃষ্ণ চরিত্রের একমাত্র উজ্জ্বল রেখা। দেবেন্দ্রই হীরার তীর্থধর্ম্ম, দেবেন্দ্রই হীরার নীতি কর্ম্ম। দেবেন্দ্রই হীরার ইহকাল, দেবেন্দ্রই হীরার পরকাল। দেবেন্দ্রই হীরার হৃদয়াকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা। দেবেন্দ্রের জন্যই হীরা কলঙ্কিনী। হীরার হিংসা, হীরার দ্বেষ, হীরার নরদ্রোহিতা সমস্তই দেবেন্দ্রের জন্য। দেবেন্দ্র ভিন্ন হীরার অন্য কোন স্বার্থ ছিল না। দেবেন্দ্র ভিন্ন হীরার জীবনের আর কোন লক্ষ্য ছিল না। হীরা দেবেন্দ্রকে সহস্র দোষের অধিকারী জানিয়াও, তাহার পক্ষপাতিনী। হীরা দেবেন্দ্রকে বিশ্বাসঘাতক লম্পট জানিয়াও, তাহার পক্ষপাতিনী। রমণীর সতীত্বনাশ দেবেন্দ্রের নিত্য ব্রত জানিয়াও হীরা তাহার জন্য উন্মাদিনী। নগেন্দ্রপ্রেমে হতাশ হইয়া সূর্য্যমুখী দেশত্যাগিনী, নগেন্দ্রপ্রেমে বঞ্চিত হইয়া কুন্দ প্রাণত্যাগিনী, কিন্তু দেবেন্দ্রপ্রেমে হতাশ হইয়া হীরা উন্মাদিনী। প্রণয় প্রতিহত হওয়ায় সূর্য্যমুখী ও কুন্দের হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাব সকল পরিস্ফুট হইল, প্রণয় প্রতিহত হওয়ায় হীরার হৃদয়ের নারকীয় ভাব সকল প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিল। প্রণয়-প্রতিঘাতে হীরা রাক্ষসী, প্রণয়-প্রতিঘাতে সূর্য্যমুখী ও কুন্দ দেবী। প্রত্যাখ্যান করিয়াও নগেন্দ্র—সূর্য্যমুখী ও কুন্দের উপাস্য, প্রণয়ের অবমান করায় দেবেন্দ্র

হীরার প্রতিহিংসা। নগেন্দ্রপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াও সূর্য্যমুখী ও কুন্দ নগেন্দ্রের শুভাকাঙ্ক্ষিণী দাসী, দেবেন্দ্রপ্রেমে বঞ্চিত হইয়া হীরা দেবেন্দ্রের অমঙ্গলে উল্লাসিনী প্রতিহিংসা-পরায়ণা রাক্ষসী। এই নরক ও স্বর্গের একত্র সংমিশ্রণে স্বর্গেরই শোভা অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

উপসংহার।

"বিষবৃক্ষ" একটী রমণীয় উদ্যান। এই উদ্যানে প্রবেশ করিলে নানা-জাতীয় পুষ্পের সৌরভে ভ্রমণকারীর চিত্ত স্বতঃই উন্মাদিত হয়। ইহাতে এত সৌরভ স্বতঃ-প্রসৃত হইতেছে যে, সুগন্ধ আঘ্রাণ করিবার জন্য কাহারও ফুলের মালা বা ফুলের তোড়া কিনিতে অভিরুচি হয় না। তথাপি এত ফুলের সমাবেশ দেখিয়া কোন্ মালাকর মালা না গাঁথিয়া বা তোড়া প্রস্তুত না করিয়া থাকিতে পারে?

এই নন্দনকাননে কোন জঞ্জাল নাই বা পারিপাট্যের কোনও ত্রুটি নাই, আমরা তাহা বলিতে প্রস্তুত নহি। কোন্ কানন সম্পূর্ণ জঞ্জালশূন্য, কোন্ উদ্যান নির্দ্দোষ পারিপাট্যের আধার? আমরা সেই সকল সামান্য দোষ ও সামান্য ত্রুটির উল্লেখ করিয়া আপনাদিগের অসহৃদয়তার পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি না।

সমাপ্ত।

ভারত-সভা।*

যখন ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমরা 'ভারতের ভা
পরিণামে' ইহার ভাবী পরিণাম কি হইবে, অগ্রেই বলিয়া দি
ছিলাম। অধুনা বিভিন্ন-ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন-সমাজবন্ধন, অসংখ্য-ভা
কথনশীল ও নানা-পরিচ্ছদপরিশোভিত ভারতের মিশ্র-অধিবাসিবৃন্দে
পরস্পর-মিলনের একমাত্র স্থল 'ভারত-সভা'। আমরা প্রথম হ
তেই ইহার যে গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, ইহা ধীর ও নিশ্চি
পাদবিক্ষেপে ঠিক সেই গতিপথে চলিতেছে। সমস্ত ভারতকে এব
কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সমাজের সহিত গ্রথিত করিতে, ইহা বিবি
চেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। ইহার প্রচারকগণ নানা স্থা
গিয়া উদ্দীপনাবাক্যে তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দকে কেন্দ্রীভূত সভার সহি
সূত্রবদ্ধ করিতেছেন। সমস্ত ভারত যেন ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে
কলিকাতা, এলাহাবাদ, লাহোর, বোম্বে ও মান্দ্রাজ—যেন এক সূ
সম্বদ্ধ হইতেছে। এ সূক্ষ্ম সূত্র সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন এখনও সক
দেখিতে পাইতেছেন না বটে, কিন্তু কালে যখন ইহা স্থূলতর ও ঘন
গাঢ়তর হইবে—তখন ইহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইবে। ভারত-স
বিলাতের হাউস্ অব্ কমন্সের প্রতিরূপ; এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়
সভা হাউস্ অব্ লর্ডের প্রতিরূপ। যখন ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট
প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন হাউস্ অব্ কমন্সের অস্তিত্ব ছিল না। ই
লণ্ডের রাজারা কোন বিষয়ে কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে হইলে
কেবল ব্যারণ্ বা ভূম্যধিকারিগণকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের সহি
পরামর্শ করিতেন। লোকসাধারণের প্রতিনিধিগণকে তাঁহারা পর
মর্শ করিবার যোগ্য-পাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু প্রকৃতি

* The Third Annual Report of the Indian Association, 1878-7

গতি কে রোধ করিতে পারে? অসংখ্য লোকের সুখ দুঃখের নিয়মন অতি অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে থাকা অস্বাভাবিক, তাহাতে অবিচার ও পক্ষপাত হইবে। অসংখ্য লোকের রক্তশোষণ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা পরিবার অস্বাভাবিকরূপে পরিপুষ্ট হইবে, এবং সাধারণ লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইবে, এইরূপ অবস্থা অধিক দিন চলিতে পারে না। লোকে বহুকাল নিমীলিত নেত্রে থাকিতে পারে না। ক্ষুধার জ্বালায় ও অবিচারের কশাঘাতে তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। তখন অন্তর্বিপ্লব অনিবার্য্য ; এইরূপ নিরন্তর অন্তর্বিপ্লবে ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ ক্রমেই অপহৃত প্রাকৃতিক স্বত্ব সকল পুনঃপ্রাপ্ত হইতেছেন। হাউস্ অব্ কমন্স টিউডার রাজবংশীয়গণের সময় পদে পদে অপমানিত ও তিরস্কৃত হইত, সেই হাউস্ অব্ কমন্সই এখন ইংলণ্ডে সর্ব্বে-সর্ব্বা। এখন ইহার প্রতাপে হাউস্ অব্ লর্ডস কম্পিতকলেবর। অচিরকাল-মধ্যেই বোধ হয় হাউস্ অব্ লর্ড্স হাউস্ অব্ কমন্সের কুক্ষিগত হইবে। আমেরিকাতে হাউস্ অব্ কমন্স ও হাউস্ অব্ লর্ড্স বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র সভা নাই। একটী মাত্র সভা সমস্ত জাতির প্রতিনিধি। ইহাতে কমন্স ও লর্ড্স—দুই দলই সমান ভাবে বসিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন ও ব্যবস্থাপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্টও এই আদর্শে সংগঠিত হইয়াছে। এই বিশ্বজনীন সাম্যের ভাব সর্ব্বপ্রথমেই ফ্রান্সেই আবির্ভূত হয়; ফ্রান্স হইতে আমেরিকায় যাইয়া পরিশোধিত হইয়া আবার বিশুদ্ধ অবস্থায় ফ্রান্সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অধুনা জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে আমেরিকা ও ফ্রান্সের আদর্শে গঠিত করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। কত দিনে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক, যখন সভ্যতায় অধিকতম সমুজ্জ্বল জাতি-সকল বৈষম্যের ভিত্তিভূমি-স্বরূপ ব্যবস্থাপক ও নিয়ামক সভার ঐকতানিকতা সম্পাদন করিয়াছেন বা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তখন ভারতবর্ষ সেই পরিত্যক্ত সৌধের উপর রাজনৈতিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে কেন ইচ্ছা করিতেছেন জানি না। যখন বিশ্বজনীন

একতার নিতান্ত প্রয়োজন, তখন জমিদারগণ জনসাধারণের সমাজের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে স্বীকৃত না হন কেন? দাসগণের মধ্যে আবার ছোট বড় ভেদ কেন? জমিদারগণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা নামক একটী স্বতন্ত্র সভা না রাখিয়া ভারতসভার সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হইলে, জাতীয় উদ্দীপনা-কার্য্য কত শীঘ্র সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা বোধ হয়, তাঁহারাও বুঝেন। তবে আর কেন বৃথা অভিমানভরে এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্য করিয়া আপনাদিগের কার্য্য-করণশক্তির অপব্যবহার করেন? তাঁহাদিগের অর্থ ও লোকতান্ত্রিক দলের অধ্যবসায় ও উৎসাহবত্তা একত্র সম্মিলিত হইলে,জাতীয় সমন্বয়-কার্য্য অতি শীঘ্র সম্পাদিত হইতে পারে। ভারত সভার অধ্যবসায় ও উৎসাহ অমিত, কিন্তু ইহার অর্থবল নাই। জমিদার সভার অর্থ আছে, কিন্তু তত দূর উৎসাহ অধ্যবসায় নাই। এই দুই একত্র মিলিত হইলে ভারতের আর কি অভাব? প্রজাগণের সহিত—জনসাধারণের সহিত

জমিদারগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদিগের উচ্ছেদ বৈ মঙ্গল নাই। লোকসাধারণ তাঁহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবে, কিন্তু তাঁহারা কখন লোকসাধারণের উচ্ছেদ-সাধন করিতে পারিবেন না। ভারতসভা সর্ব্বশুদ্ধ পোনরটী শাখা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বারটী বঙ্গে, দুইটী উত্তর-পশ্চিম-বিভাগে ও একটী পঞ্জাবে। মান্দ্রাজ ও বোম্বে এখনও ভারত-সভার অন্তর্ভুক্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা সকল সাধারণ-বিষয়েই ভারত-সভার সহিত ঐকতানে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের সহানুভূতির অপ্রতুল নাই। তবে তাঁহারা প্রাদেশিক অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এখনও মাধ্যমিক সমাজের অধীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, ভারতে পূর্ণ একতা সংস্থাপিত করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কোন মাধ্যমিক সভার অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। জাতীয় শক্তির কেন্দ্রীকরণ ভিন্ন জাতীয় শৃঙ্খলা ও একতা সম্ভবপর নয়।

গত বৎসর ভারত সভা একটী গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফলে আমরা সর্ব্বপ্রকার উচ্চ-

পদ হইতে বঞ্চিত। কোন বিভাগেরই শীর্ষস্থানীয় হইতে আমাদিগের কোন অধিকার নাই। যেন বিধাতা আমাদিগকে শ্বেত পুরুষের অধীন হইয়া থাকিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন! রোম যখন গ্রীসের স্বাধীনতা হরণ করেন, তখন গ্রীসেরও এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। গ্রীকেরা বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যে রোমীয়গণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি অতি সামান্য সামান্য কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকিত মাত্র। আমরা বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যে ইংরাজদিগের শ্রেষ্ঠ না হই, আমাদের সুশিক্ষিত দলের অনেকেই তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। যদি সিবিল্ সার্ব্বিস্ পরীক্ষা ভারতে গৃহীত হইত, যদি ইংরাজদিগকে ভারতে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী কভেনেণ্টেড্ সার্ব্বিস্ একচেটিয়া করিয়া লইত। বিলাতে পরীক্ষা গৃহীত হওয়ায় সে সার্ব্বিসের দ্বার অধিকাংশেরই নিকট রুদ্ধ হইয়া আছে। যে দুই চারি জন করিয়া প্রতি বৎসর সার্ব্বিসের জন্য বিলাতে যাইতেছিল, তাহারা প্রায় অধিকাংশই দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকল হইতে পরিক্ষিপ্ত। যাহা হউক পূর্ব্বে বয়সকাল একবিংশতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তবু দুই চারি জন করিয়া প্রতি বৎসর যাইতেছিল, এবং তাহার মধ্যে অনেকেই কৃতকার্য্যও হইতেছিল। কিন্তু এখন বয়স কাল অষ্টাদশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার অর্থ, ভারতবর্ষীয়দিগকে আর কভেনেণ্টেড্ সার্ব্বিস্ দেওয়া হইবে না; কারণ কোন্ অভিভাবক সপ্তদশবর্ষীয়, একাকী ও অসহায় বালককে সেই দূর দেশে প্রেরণ করিবেন? সুতরাং সে দ্বার ভারতবাসিগণের পক্ষে একরূপ সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে।

স্থিতিশীল গবর্ণমেণ্ট ব্যথিত ভারতবাসিগণকে ভুলাইবার জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন 'ভারতবাসিগণকে অনেক অর্থ ব্যয়ে ও অনেক জাতীয় নির্যাতন সহিয়া বিলাত গমন করিতে হয়। লাভের সহিত তুলনায় যে ক্ষতি হয়, তাহার পূরণ হয় না। অতএব এখন হইতে তাহাদিগকে আর সে কষ্ট লইতে হইবে না;

এখন হইতে ভারতে থাকিয়াই তাহারা অভীষ্টলাভ করিবে।' এই কথায় প্রথম প্রথম অনেকেই ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু ভারত-সভা তাহাতে ভুলিবার নন। ভারত-সভা জানিতেন, ইহারই অভ্যন্তরে কোন গূঢ় অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন আছে; তাঁহারা জানিতেন যে, আন্দোলনকারিগণের মুখবন্ধ করিবার নিমিত্তই তাঁহারা এই সাময়িক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন; তাঁহারা জানিতেন যে, দুই একটী অযোগ্য পাত্রে সেই উচ্চ কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহারা অক্ষম হইলে তাঁহাদিগের অক্ষমতা লইয়া তাঁহারা বিশেষ আন্দোলন করিবেন, এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন যে, ভারতবাসী এখনও উচ্চ পদের যোগ্য হয় নাই। এই জন্য ভারত-সভা প্রথম হইতেই এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা অনুগ্রহ চাহেন না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাহেন কারণ, তাঁহাদিগের মতে অনুগ্রহলব্ধ সৌভাগ্য, জাতীয় অধঃপতনের লক্ষণমাত্র। বিজেত্রী জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সমরে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারা জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে চাহেন। এই জন্য তাঁহারা স্থিতিশীল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পার্লেমেণ্টে আবেদন করিবার নিমিত্ত এক জন প্রতিনিধি পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। সকলেই জানেন, প্রসিদ্ধ নামা লালমোহন ঘোষ সেই প্রতিনিধির পদে অভিষিক্ত হন। প্রতিনিধি পাঠাইতে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহার জন্য ভারতসভাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ সমস্ত ভারত একবাক্যে ভারত সভার এই উদ্যোগের অনুমোদন করেন। ইহার ফল আর কিছু না হউক, ইহাতে ভারতের গ্রন্থন-সূত্র দৃঢ়তর হইয়াছে। ভারত যে একতানে কার্য্য করিতে পারেন, এই আন্দোলন দ্বারা তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

ভারতসভা দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাযন্ত্র বিধির বিরুদ্ধে সবিশেষ আন্দোলন করিয়া উন্নতিশীল দলের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। স্থিতিশীল দল ভারতে কিরূপ অপ্রিয় হইয়াছিলেন, ভারত-সভা এরূপ আন্দোলন না করিলে ইংলণ্ডের নির্ব্বাচকেরা কিছুতেই তাহা জানিতে

পারিতেন না ; তাহা হইলে নির্ব্বাচন-কালে তাঁহাদিগের হৃদয় কোন্ দিকে লীন হইত, কে বলিতে পারে? মুদ্রাযন্ত্র-বিধির ব্যবস্থাপনের পর ভারত-সভা ভারতের গগণ বিদারিয়া এইরূপ আন্দোলন না করিলে ইহার পরিশোধন হইত কি না সন্দেহ। তাহা না হইলে সেই কঠোর বিধি কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া দেশ রসাতলে দিত, সাহিত্য-রাজ্য ছারখার করিত সন্দেহ নাই।

ভারত-সভা আফ্গান যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধে ন্যস্ত করা ন্যায়-বিগর্হিত—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া পার্লেমেণ্টে আবেদন করেন। ভারত-সভার ক্রন্দনে পার্লেমেণ্টের হৃদয় কাঁদিয়াছে কি না জানি না ; তবে অন্ততঃ এই উপকার হইয়াছে যে, সেই মহতী সভার সভ্যেরা এখন জানিতে পারিয়াছেন, ভারতবাসীরা অন্তরের দুঃখ সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে। সম্মুখে কাতর স্বরে কাঁদিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। একবার দুইবার তিনবার—সে ক্রন্দন উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু চতুর্থবারে সে ক্রন্দন না শুনিয়া আর থাকিতে পারে না। সুতরাং এইরূপ বারবার ক্রন্দন করিতে করিতে আমরা একদিন নিশ্চয়ই সিদ্ধ-কাম হইব।

আমরা বোধ হয় অনেকেই জানি, আমাদিগের লজ্জা নিবারণের জন্য ইংরাজেরা আমাদিগের দেশ হইতে তুলা লইয়া গিয়া কাপড় বুনিয়া আমাদিগের জন্য ভারতে আনিয়া থাকেন। ইংরাজেরা আমাদিগকে কাপড় না দিলে আমাদিগকে উলঙ্গ থাকিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের লজ্জার বিষয় আর কি কিছু আছে? জাতীয় অধঃপতনের ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু অপ্রিয় হইলেও ইহা অকাট্য সত্য যে, আমরা এ বিষয়ে অতি অসভ্য জাতিরও অধম। ইংরাজেরা কলে কাপড় বুনিতে পারেন বলিয়া আমাদিগের তন্তুবায়গণ অপেক্ষা অনেক সস্তায় কাপড় দিতে পারেন। এই জন্যই আমাদিগের তন্তুবায়কুল ক্রমেই নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। ভারতের তন্তুবায়কুলকে রক্ষা করিবার জন্য একটী রক্ষাকর (Protection duty) সংস্থাপিত হয়। ভারত হইতে ম্যানচেষ্টারে যত তুলা যায়,

তাহার উপর কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে শুল্ক ধার্য্য করিলে বিলাতী কাপড়ের দর চড়িয়া যাইতে পারে। তাহা হইলেই দেশীয় কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক কাটিতে পারে, সুতরাং ভারতের তন্তুবার-কুল একেবারে নির্ম্মূল হয় না, এবং রাজস্বেরও বৃদ্ধি হয়। এইরূপ সঙ্গত উপায়ে রাজস্ব বৃদ্ধি হইলে প্রজাদিগের প্রতি অযথা কর-স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। কোন দুর্ব্বল জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বাধীন বাণিজ্যের গতি রোধ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর যে কর-স্থাপন করা হয়, তাহারই নাম রক্ষাকর। যেমন কোন পালওয়ানের সহিত মল্লযুদ্ধে দুর্ব্বলের প্রাণসংশয়, সেইরূপ অতি উন্নতিশীল জাতির সহিত স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের মত দুর্ব্বল জাতির প্রাণধ্বংসের সম্ভাবনা। এই জন্য রক্ষাকর আমাদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। লর্ডনর্থব্রুকের সময়ে স্যালিসবরী যখন রক্ষাকর উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন সেই সহৃদয় গবর্ণর জেনেরেল ভারতের ভাবী দুঃখ অনিবার্য্য ভাবিয়া নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্ররোচনায় অসময়ে নিজের কার্য্য হইতে অবসৃত হন। যে ব্যক্তি সেই দুরূহ কার্য্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম, তাঁহারই হস্তে তখন ভারতের বিশ কোটী অধিবাসীর অদৃষ্ট সমর্পিত হইল। সকলেই জানেন, এই নৃশংস কার্য্য লর্ড লীটন আসিয়া এক দিনে সম্পন্ন করিলেন।

এই রক্ষাকর ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য ভারত-সভা পার্লেমেণ্টে আবেদন করেন। ইহারও ফল অব্যবহিত কিছু না হউক, ব্যবহিত কিছু আছেই সন্দেহ নাই।

ভারত-সভা এইরূপ আরও কত শত দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন তাহা গণনা করা যায় না। কিন্তু ভারত-সভাকে একটী বিষয় স্মরণ করাইয়া দিব। ভারত-সভা জন্মদিনে যে, 'লোক শিক্ষা'ই প্রধান লক্ষ্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, আজও সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আশা করি সে প্রতিজ্ঞা শীঘ্র পূরণ করিবেন।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনী।*

বলা বাহুল্য যে, শীর্ষোল্লিখিত সুরেন্দ্রনাথ, ভারত-সভার নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ অগ্রে সুশিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই নিকট পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরমবন্ধু বিচারপতি নরিশের গুণে, তিনি আজ ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত। সামান্য কৃষক হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার নাম শুনিয়াছে। সকলেই তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মের পরমবন্ধু বলিয়া জানিয়াছে। মানুষ ঘটনার দাস। বড় ঘটনায় বড় লোক প্রস্তুত হয়। আজ যে অজ্ঞাতনামা—কাল সে প্রখ্যাতনামা হইতে পারে। বড় বড় ঘটনা নিত্য উপস্থিত হয় না। সেই ঘটনা-রঙ্গালয়ে অভিনয় করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা প্রস্তুত হইয়া থাকেন, সময় তাঁহাদিগকেই অভিনেতা নির্ব্বাচিত করিয়া লয়, এবং নির্নামতার অন্ধকার হইতে তুলিয়া তাঁহাদিগকে জগৎসমক্ষে ধারণ করে। ফরাশি বিপ্লব উপস্থিত না হইলে, হয় ত নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টকে সামান্য সৈনিকের পদে ব্রতী থাকিয়া জীবন কাটাইতে হইত। তাহা হইলে তাঁহার ধন-বিধরিণী প্রতিভায় জগৎ একদিন ঝলসিত হইত না। ইংলণ্ডের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে, বোধ হয় ওয়াসিংটনের প্রতিভা অঙ্কুরে বিদলিত হইত। দৃপ্ত এড্‌ওয়ার্ড ছলে বলে কৌশলে স্কট্‌লণ্ড হস্তগত করিবার চেষ্টা না করিলে ওয়ালেস্ ও ব্রুসের স্বদেশানুরাগ হয় ত উদ্দীপিত হইত না। প্রথম চারল্‌সের অত্যাচারে ইংলণ্ড প্রপীড়িত না হইলে, বোধ হয়, হ্যাম্‌ডেন ও ক্রম্‌ওয়েলের নাম কেহ জানিতে পারিত না। অষ্ট্রিয়ার দৌরাত্ম্যে ইতালী মর্ম্মাহত না হইলে, ঋষিপ্রবর ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর স্বদেশানুরাগের অদ্ভুত কাহিনী আজ জগৎকে উন্মাদিত

*শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বরাট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক আনা মাত্র।

করিত না। জন্মভূমির দুর্বিষহ যন্ত্রণায় উদ্দীপিত না হইলে কসুথ
কসাথের স্বদেশানুরাগের জলন্ত দৃষ্টান্তে আজ জগৎ উদ্ভাসিত হইত ন
সুতরাং বলিতে হইবে যে, বড় বড় ঘটনায়, বড় বড় লোক প্রস্তুত হয়
যাঁহার জীবন যে পরিমাণে তরঙ্গায়িত, তিনি সেই পরিমা
অসাধারণ হইয়া উঠেন। ঘাত প্রতিঘাতেই চরিত্র গঠিত হয়। আরে
ও অবরোহ যেমন সুরের জীবন, সেইরূপ ঘাত প্রতিঘাত চরিত্রে
জীবন। যত দিন সুরেন্দ্রের জীবন শান্তিময় ছিল, তত দিন তাঁহ
প্রতিভা বিকসিত হয় নাই। যদি তাঁহার জীবনে তরঙ্গ না উঠি
তাহা হইলে তিনি একজন সামান্য সিবিলিয়ান্ মাত্র রহিয়া যা
তেন। তাঁহার নাম লইয়া এরূপ সর্বব্যাপী আন্দোলন হইত না।
জেলায় যখন থাকিতেন, সেখানকার লোকেই তাঁহাকে চিনিত মাত্র
কিন্তু সুরেন্দ্রের ললাটে বিধাতা অপূর্ব্ব সৌভাগ্য অঙ্কিত করি
রাখিয়াছেন, তাই তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীর ষড়্যন্ত্রে তিনি সার্ভি
হইতে তাড়িত হইলেন। বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করে? সেই দি
হইতে তাঁহার অদৃষ্ট-গগণে দ্বাদশ রুদ্রের আবির্ভাব হইল। সাগ
ছাঁচিয়া যে মাণিক পাইয়াছিলেন, তাহা হারাইয়া প্রথমে তিনি দিশ
হারা হইয়াছিলেন। স্রোতস্বিনী প্রচণ্ডবেগে যাইতেছিল, হঠাৎ এক
অভাবনীয় বাধা পাইয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইল। কিন্তু বিস্ময়ের ভা
তিরোহিত হইলে আবার ফিরিয়া উৎপত্তি-স্থানে যাইতে কৃতসঙ্ক
হইল। সুরেন্দ্রনাথ সার্ভিসে ঢুকিয়া ঘোরতর সাহেব হইয়াছিলেন, (
সময় স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অল্পই মিশিতেন। তিনি আশৈশ
বৈদেশিক আচার ব্যবহারে ও রীতি নীতিতে দীক্ষিত ছিলেন, সুতর
দেশীয় আচার ব্যবহারে ও রীতি নীতিতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছি
না। বৈদেশিক ভাষায় তাঁহার অধিকতর পটুতা জন্মিয়াছিল বলি
তিনি বৈদেশিক ভাষায় লিখিতে, বক্তৃতা করিতে ও কথোপকথ
করিতে অধিকতর ভাল বাসিতেন। এ সমস্তই জাতীয় নেতার প্রতি
কূল। যাহা চাকরীর পক্ষে গুণ, জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষে তাহা বিগুণ
চাকরী-ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর সুরেন্দ্রের মনে মনে

জাতীর নেতা হইবার আশা অঙ্কুরিত হইল। যে সকল বিগুণ তিনি স পদের অযোগ্য, সুরেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি ক্রমে ক্রমে সাহেবী ছাড়িতে লাগিলেন। যদিও তিনি এখনও সাহেবী সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারেন নাই, তথাপি শ্রীহট্টের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এছ এন বানার্জি ও ভারত-সভার অধিনায়ক বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে এক পদার্থ নহেন, তাহা সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে বলিবেন। যে সুরেন্দ্র এক দিন স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখিয়া নাসিকা সঙ্কোচিত করিয়া দূরে সরিয়া যাইতেন, আজ সেই সুরেন্দ্র অনেকের সহিত মিশিতে বিশেষ সমুৎসুক। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কারের এমনই বল, যে সুরেন্দ্রের বাক্য ও কার্য্যে সময়ে সময়ে বিষম অসা-মঞ্জস্য ঘটিয়া পড়ে। তিনি লিখিবার সময়ে ও বক্তৃতার মুখে জন-সাধারণের দুঃখে যেরূপ কাঁদিয়া আকুল হন, কার্য্যে সময়ে সময়ে তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া ফেলেন। মফঃস্বলে যাইয়া তিনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর আলয়েই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেখানে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় মিলে, সেখানকার আতিথ্য পারৎপক্ষে প্রত্যাখ্যান করেন না। দরিদ্রের কুটীর বা নিরন্ন গৃহস্থের জীর্ণ আবাসের অভ্যন্তরে তিনি কখন পদার্পণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। যদি বাস্তবিকই জন-সাধারণের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদে, তবে তাহাদের সহিত না মিশিয়া তিনি কিরূপে থাকিতে পারেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এরূপ ব্যবহার জাতীয় নেতৃত্বের অনুকূল নহে।

কর্ম্মচ্যুত হওয়ার পর ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার প্রতিভা বিকসিত হইতে লাগিল। অন্তর্নিগূহিত প্রতিভার স্ফুরণের প্রধানক্ষেত্র কলিকাতা। তিনি শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় আসিলে, সকলেই তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট না হয়, এই জন্য পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে মেট্রপলিটন কালেজের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার পাঠনার গুণে মেট্রপলিটন কালেজে অসংখ্য ছাত্র প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অধিক কি, প্রেসিডেন্সী কালেজ পর্য্যন্ত টলমল করিতে

লাগিল। ক্যাথিড্রাল কালেজের ছাত্র এত কমিয়া গেল যে, কালেজের কর্তৃপক্ষীয়েরা কালেজটী উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। সিটী কালেজও তাঁহার নামের মোহিনী শক্তিতে অল্প দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কালেজের প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিল। তিনি নিজে প্রেসিডেন্সী স্কুল (এখন রিপণ কালেজ) নামক যে স্কুল চালাইতেছেন, তাহাও উচ্চদরের স্কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যুত ছাত্রসমাজে তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে যে, তিনি যেখানে যান, ছাত্রেরা যেন তাঁহার পশ্চাদ্গামী হয়। তাঁহার পদার্পণে ক্রিচর্চ্চেরও এক্ষণে সমূহ উন্নতি হইয়াছে। ছাত্র-মহলে এরূপ পসার আমাদের দেশে আর কাহারও কখন হইয়াছিল কি না আমরা জানি না। তিনি যে শুদ্ধ কলিকাতার ছাত্রবর্গের দেবতা এরূপ নহেন; অতি দূরস্থ পল্লীগ্রামের ছাত্রেরাও তাঁহার নামে উন্মাদিত। অনেকে প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত। বালকের কথা তত দূর কার্য্যে পরিণত হউক বা না হউক, সুরেন্দ্র বাবু যে তাহাদের হৃদয়ের উপাস্য দেবতা ইহা, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এরূপ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। ফ্রান্সে গ্যাম্বেটার ভাগ্যেই এইরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ইহা তাঁহার রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের একটী প্রধান উপাদানস্বরূপ হইয়াছিল।

ছাত্র-দেবতা হওয়ায় সুরেন্দ্র বাবুর একটী অনিষ্ট হইয়াছে। ছাত্রদের অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া তিনি অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছেন। অনেক শিক্ষক ও অভিভাবক আমাদের নিকট অনুযোগ করিয়াছেন যে, ছাত্রেরা আর তাঁহাদিগকে মানে না; তাঁহাদিগের কথা শুনে না। তাহারা পড়া শুনা ছাড়িয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া বেড়ায়। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। আমরা দুই একটী সভায় দেখিয়াছি যে, ছাত্রেরা সুরেন্দ্র বাবু ও আরও দুই এক জন ভিন্ন আর কাহাকেও কোন কথা বলিতে দেয় না। বলিতে উঠিলে বিকট শব্দ করে ও করতালি দেয়*।

*সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম, এই ভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আশা করি অচিরেই উহার সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দ্ধান হইবে।

রূপ অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। ছাত্রেরা দুর্বিনীত হইলে, আমাদের দেশের সমূহ অনিষ্ট। যাহারা ভারতের ভাবিষ্য আশাস্থল, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব হইলে আমাদের আর কি আশা? সুরেন্দ্র বাবুকে আমরা বন্ধুভাবে অনুরোধ করি, তিনি যেন ছাত্রদের উত্তেজন না করিয়া নিয়মন করিতে চেষ্টা করেন। কারণ, নৈতিক উৎকর্ষ ব্যতীত জাতীয় উন্নতির আশা নাই। আর মত্ত হস্তীর মাহুত হওয়াও বড় প্রার্থনীয় জিনিস নহে।

ছাত্রদেবতা হওয়ার আরও একটী বিষময় পরিণাম এই হইয়াছে যে, সুরেন্দ্র বাবু, তাঁহার বক্তৃতা ছাত্রবর্গের হৃদয়গ্রাহিণী হইলেই, পরিতুষ্ট হন। যে কোটী কোটী নিরক্ষর ভারতবাসীর মুখপত্র বলিয়া তিনি আপনাকে পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহারা তাঁহার বক্তৃতা বুঝিতে পারে না, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন না, ছাত্রবর্গের প্রশংসা পাইয়াই তিনি আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। যদি তিনি বাস্তবিক জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তাহা হইলে জনসাধারণ যাহাতে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারে অতঃপর তিনি তাহার বিধান করিবেন। ভবিষ্য উকিলকে বক্তৃতা করিতে শিখাইয়া দেশের বিশেষ কি উপকার করিবেন? বিধাতা তাঁহাকে অপূর্ব্ব বক্তৃতা-শক্তি দিয়াছেন, ছাত্রবর্গের কোমল মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত করিবার জন্য নহে, জনসাধারণকে রাজনৈতিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য। জীবনীলেখক লিখিয়াছেন "বিখ্যাত ভারতসভা প্রধানতঃ ইহাঁর ও শ্রদ্ধের বাবু আনন্দমোহন বসুর ঐকান্তিক যত্ন ও অর্থসাহায্যের ফল।" জীবনীলেখক ভারত-সভা-সম্বন্ধে অতি অল্পই জানেন বলিয়া বোধ হইতেছে। দুই জন লোকের চেষ্টা ও ধনে ভারতসভা প্রবল ভারতীয় লীগ ও বিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে কখন দাঁড়াইতে পারিত না। অনেকগুলি কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া ভারত-সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন; কলিকাতা ও মফঃস্বলের নানা স্থানে যাইয়া ভারতসভার অনুকূলে জনসাধারণের মত ফিরান। যে বুঝাইলে বুঝে, তাহাকে বুঝাইয়া, যে বুঝে না, তাহাকে অনুনয়

করিয়া সভামন্দিরে আনয়ন করেন। যাঁহাদিগকে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে কত পরিহাস বিদ্রূপই সহ্য করিতে হইয়াছিল। একজন বড়লোক তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে "গঙ্গার জলে টাকা ফেলিয়া দিব, তথাপি ভারতসভার চাঁদার জন্য টাকা দিব না"। কত জায়গায় যে রাজনৈতিক প্রচারকগণকে কত কথা শুনিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুরেন্দ্রবাবু ও আনন্দমোহন বাবুকে সে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। তবে তাঁহারা যে ভারত-সভার উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। সুরেন্দ্র বাবুর নিকট ভারতসভা আবার বিশেষ ঋণী। সিবিল সার্ব্বিস্, মুদ্রাবিধি, আত্মশাসনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ভারতসভা যে সকল আন্দোলন করিয়াছে, সুরেন্দ্রবাবুই সে সকল আন্দোলনের প্রাণভূত।

সুরেন্দ্রবাবুর বাগ্মিতাশক্তি তাঁহার "শিখজাতির অভ্যুদয়" "ম্যাট্সিনি" "চৈতন্য" প্রভৃতি বক্তৃতায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, সে শক্তির চিহ্ন আমাদের জাতীয় সাহিত্যে রহিবে না। বৈদেশিকেরাও যে যত্ন করিয়া সে গুলিকে নিজ সাহিত্যে স্থান দিবে, তাহার আশা নাই। সুতরাং কালে তাহা বিলুপ্ত হইবে।

সুরেন্দ্রবাবু যেরূপ যোগ্যতার সহিত "বেঙ্গলী" পত্র চালাইতেছেন, তাহাতে তিনি দেশের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রত্যুতঃ জমীদারগণের মুখযন্ত্রস্বরূপ হিন্দুপেট্রিয়টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক "বেঙ্গলী" ভিন্ন অন্য ইংরাজী-সংবাদপত্র আর নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা তাঁহাকে আর কি করা যাইতে পারে?

সুরেন্দ্রবাবুর পরিশ্রমশক্তি যে অসাধারণ, এ বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। অতি অল্প বাঙ্গালীকেই এরূপ অবিরাম কার্য্য করিয়া অক্লান্ত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কখন তাঁহাকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে দেখি নাই। তিনি সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও কখন নিজের কাজ অবহেলা করেন

নাই। নিজের কাজ করিয়াও সাধারণ কাজ করিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকে। তিনি যে কাজে হাত দেন, সে কাজ কখন অসম্পূর্ণ রাখেন না। এরূপ অধ্যবসায়গুণেই তিনি যে কাজে হাত দেন, সেই কাজেই কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। যাহা অপরে অসম্ভব বলিয়া উঠে, অলৌকিক অধ্যবসায় বলে তিনি তাহা সম্ভব করিয়া তুলেন। বাধা-বিপত্তি তাঁহার গতিরোধ করিতে অক্ষম। তিনি নির্ভীক চিত্তে স্থির-পদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতে থাকেন। সেই নির্ভীক ভাব দেখিয়া ভীরুর ভয় ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সকলেই তাঁহার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হয়। যাঁহার এরূপ শক্তি, তিনি যে জাতীয় নেতা হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি ?

সম্বন্ধ-নির্ণয়।*

সুবিখ্যাত অধ্যাপক ভট্ট মক্ষমূলর তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে "যে জাতি আপনার অতীত ইতিহাসে জাতীয় গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা করে না, তাহার জাতীয় চরিত্রের মূল-ভিত্তি পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। যৎকালে জার্ম্মাণীতে রাজনৈতিক দুরবস্থার পরিসীমা ছিল না, তৎকালে ইহা আপনার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় নিমগ্ন হয়, এবং অতীতের আলোচনা হইতে ভবিষ্যতের আশা সংগ্রহ করে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অধুনা ভারতেও ঠিক এইরূপ ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের ভারত-বিষয়ক বহুদর্শন তাঁহা অপেক্ষা অনেক অধিক; এবং আমরা স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি যে, ভারতে ইহা আজও প্রকৃত প্রস্তাবে আরব্ধ হয় নাই। দুই একজন পুরাবিদ্ পুরাবৃত্তের অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু অদ্যাপি জাতি-সাধারণের কথা দূরে থাকুক—সুশিক্ষিত দলের মধ্যেও—ইহা সম্পূর্ণরূপে আরব্ধ হয় নাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রশংসাপত্রধারী বিদ্যাভিমানী ছাত্রকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আর বৃদ্ধ প্রপিতামহের পুরাতন গল্প শুনিয়া লাভ কি? তাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্তকে "বৃদ্ধ প্রপিতামহের পুরাতন গল্প" এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারত কবে কি ছিল, সে পুরাতন কথার আলোচনায় আর লাভ কি? যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না, তাহার জন্ত কাঁদিয়া কি হইবে? শ্রুতি স্মৃতি, রামায়ণ মহাভারত, ইতিহাস পুরাণ, সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি আর্য্য কীর্ত্তিকলাপের চর্ব্বিত চর্ব্বণে ফল কি? আর্য্য বীরগণ কবে কি করিয়াছিলেন তাহার আন্দোলনে আর

---

* বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

লাভ কি? ইত্যাদি প্রলাপ বাক্য সুশিক্ষিত দলের মুখে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর প্রায় অধিকাংশই অনক্ষর। অতি অল্পসংখ্যকই সাক্ষর। এই সাক্ষর দলের অতি অল্প সংখ্যাই আবার উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের যখন ঐরূপ মত, তখন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতদিগের নিকট আমরা কি আশা করিতে পারি?

অতীত মহিমার অনুশীলন যে পতিত জাতির অভ্যুত্থানের একটী প্রধান উপায়, অধ্যাপক মক্ষমূলরের সহিত এবিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ ঐকমত্য। জার্ম্মাণী যেমন অতীত মহিমার অনুশীলন দ্বারা রাজনৈতিক অবনতির গভীরতা হইতে উঠিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ অতীত মহিমার অনুশীলন করিলে ভারতও একদিন রাজনৈতিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন। পুরাবৃত্তের আলোচনা তাঁহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত কারণ হইবে। পুরাবৃত্তের আলোচনা তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ করিবে না বটে, কিন্তু বলিষ্ঠ হইবার ইচ্ছা প্রদান করিবে। পুরাবৃত্তের আলোচনা তাঁহাদিগের হস্তে ধন মান ও জ্ঞান আনিয়া দিবে না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তরে ধনী মানী ও জ্ঞানী হইবার ইচ্ছা বলবতী করিয়া দিবে। ইচ্ছা বলবতী হইলে, মন অভিলষিত বস্তুর দিকে আপনিই প্রবল বেগে ধাবিত হয়। এবং "ক ইপ্সিতার্থ-স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ" নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতির ন্যায় অভিলষিত বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত্ত মনের গতি কে নিবারণ করে? যে দিন ভারতে পুরাবৃত্তের আলোচনা প্রচুর পরিমাণে আরব্ধ হইবে, সেই দিন আমরা জানিতে পারিব যে ভারতের জাতীয় অভ্যুদয় অতি দূরবর্ত্তী নয়।

আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যেরা বিশাল ভারত ক্ষেত্রে অল্প-সংখ্যক হইয়া অবতরণ করিয়া কেমন করিয়া অল্প দিন মধ্যে সমস্ত ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বি রাজত্ব সংস্থাপন করেন, কেমন করিয়া তাঁহারা প্রকাণ্ড অসুরদিগকে সমরে পরাস্ত করেন, ও অবশেষে কেমন করিয়া তাঁহারা সভ্যতা-শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, এবং কি কি কারণে

সেই অত্যুচ্চ শিখর হইতে এই গভীরতম নরকে পতিত হয়েন—ইত্যাদি আলোচনা করিলে যে হৃদয় কি ভাব-তরঙ্গে আপ্লুত হয় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতিতেও সুখ—বর্ত্তমান অবনতির কারণ অনুসন্ধানেও সুখ। রোগের কারণ জানিতে পারিলে, প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। রোগের কারণ জানিতে না পারিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা উন্মত্ততা মাত্র। এইজন্য যাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্ত আলোচনা না করিয়া ভারতে ভবিষ্য উন্নতির বীজ বপন করিতে যান, তাঁহাদিগকে আমরা উন্মত্ত বলিব। যখন তাঁহারা রোগের মূল কি নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা কি ঔষধ প্রয়োগ করিবেন?

এইজন্য আমরা ভারতের হিতৈষিমাত্রকেই অনুরোধ করি যে তাঁহারা ভারতের পুরাবৃত্তের আলোচনা আরম্ভ করুন। যাঁহারা এই আলোচনার পথদর্শক হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের জাতীয় উৎসাহ ও জাতীয় ধন্যবাদের পাত্র। যাঁহারা এই গবেষণা ইংরাজী ভাষায় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নাম করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর নাম করিতে হয়। আর যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় এই গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম করিতে গেলে, রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, লালমোহন বিদ্যানিধি এবং প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করিতে হয়। আর্য্যদর্শন এই চারি জনেরই নিকট ঋণী আছে। সুতরাং আর্য্যদর্শনে এই চারি জনেরই পুস্তকের যে কিছু প্রশংসাসূচক সমালোচনা বহির্গত হইবে, তাহাই পক্ষপাত-দূষিত বলিয়া সাধারণের প্রতীতি জন্মিতে পারে। আবার যদি নিন্দা করি, তাহা হইলে আর্য্যদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই উভয় সঙ্কট জন্য আমরা আর্য্যদর্শনের লেখকদিগের পুস্তকের সমালোচনা করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু তাঁহারা যখন পীড়াপীড়ি করিয়া ধরেন, তখন তাঁহাদিগের পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না। আমরা সেই জন্য আজ সেই চারিজন গ্রন্থকারের অন্যতমের একখানি গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই গ্রন্থখানিরই নাম যে সম্বন্ধ-নির্ণয় তাহা বোধ হয় পাঠক মাত্রেই বুঝিয়াছেন। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত। অধুনা বঙ্গদেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী, মধ্যশ্রেণী ও পাশ্চাত্য প্রভৃতি নানা জাতীয় ব্রাহ্মণ; ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি নানাজাতীয় শূদ্র; নানাজাতীয় বর্ণ-সঙ্কর; এবং অল্পসংখ্যক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—বাস করিয়া থাকেন। ঊর্দ্ধতম পুরুষ ব্রহ্মা হইতে অধস্তন পুরুষ-পরম্পরার পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং সেই উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদিগের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও সামাজিক সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

লালমোহন বাবু তাঁহার প্রবন্ধে যে উপকরণ-সামগ্রীর সমাবেশ করিয়াছেন তাহা বহুমূল্য। এই উপকরণ-সামগ্রী বঙ্গের ভবিষ্য ইতিহাস-লেখকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি ইহাতে প্রকৃত ইতিহাসকে রূপক হইতে বিশ্লেষিত করিতে পারেন নাই। ইহাতে ইতিহাস ও রূপক এরূপ ভাবে সংমিশ্রিত রহিয়াছে যে, ইতিহাসকে রূপক হইতে পৃথক্ করা পাঠকবর্গের পক্ষে অতি দুরূহ।

মগধাধিপতি অশোকের সময় হইতে আদিশূরের রাজত্ব-কালের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এতদূর বাড়িয়াছিল যে, বঙ্গে ব্রাহ্মণজাতির এবং বৈদিক ক্রিয়া কলাপের একবারে লোপ হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেবল সাতশত ঘরমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, অবশিষ্ট সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বর্ত্তমান সপ্তশতীদিগের আদি পুরুষ সাতশত ব্রাহ্মণের কেহই বেদপারগ ছিলেন না, এই জন্য ৯৯৯ শকে আদিশূর নরপতি পুত্রেষ্টি যাগের জন্য কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহের নিকট পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ যজ্ঞ-নিপুণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে বীরসিংহ শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ-গোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্য-গোত্রীয় ছান্দড়, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণ-গোত্রীয়

বেদগর্ভ নামক পঞ্চ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। ইহাঁরা রাজদত্ত প্রসাদ স্বরূপ পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, এই পাঁচখানি গ্রাম পাইয়া তাহাতে বসতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের ছাপ্পান্নটী পুত্র সন্তান হইল—ভট্টনারায়ণের ষোলটী, দক্ষেরও ষোলটী, ছান্দড়ের আটটী, শ্রীহর্ষের চারিটী, বেদগর্ভের দ্বাদশটী। এই ছাপ্পান্ন জন পুত্রও বাসের নিমিত্ত রাজার নিকট ছাপ্পান্ন খানি গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। এই গ্রামগুলি রাঢ়দেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া ইহাঁরা এখন হইতে রাঢ়ী নামে আখ্যাত হইলেন। যে যে পুত্র যে যে গ্রামে বসতি করিতে লাগিলেন, সেই সেই গ্রামের নামে সেই সেই পুত্রের বংশ আখ্যাত হইতে লাগিল। এইরূপে রাঢ়ীদিগের মধ্যে পঞ্চগোত্র ও ছাপ্পান্ন গাঁইএর প্রাদুর্ভাব হইল। রাঢ়ীরা এই পঞ্চ গোত্র ও ছাপ্পান্ন গাঁইএর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন না। এই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই তা ছাড়া বামুন নাই" এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

একণে কথা হইতেছে বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কোথা হইতে আসিলেন। তাঁহারাও আপনাদিগকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণের সন্ততি বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গাঁই স্বতন্ত্র। এক্ষণে ইহার কি মীমাংসা হইতে পারে? পণ্ডিতবর লালমোহন বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত ছাপ্পান্ন ভ্রাতার সন্ততিগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ায় তাঁহারা বরেন্দ্র ভূমিতে রাজার নিকট কয়েকটী গ্রাম ভিক্ষা করিয়া বসতি করেন। সেই অবধি তাঁহাদিগের সন্ততিগণের বিভিন্ন গাঁই হইয়া যায়। ইহা লালমোহন বাবুর অনুমান মাত্র। কারণ তিনি ইহার স্বাপক্ষ্যে কোন প্রমাণ প্রদান করিতে পারেন নাই। এবং তাঁহার এই অনুমান অপ্রতিদ্বন্দ্বিও নহে। কারণ কেহ কেহ এ বিষয়ের অন্যপ্রকার মীমাংসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক বঙ্গে আসেন নাই। তাঁহারা যৎকালে বঙ্গে আগমন করেন তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বোঢ়া ভার্য্যারা বাটীতেই ছিলেন। ইহাঁরা বঙ্গে আসিয়া এখানকার ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ কন্যাকে

বিবাহ করেন; এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগের পাশ্চাত্য সহধর্ম্মিণীরা বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন; আদিশূর ইঁহাদিগের বাসের জন্য বরেন্দ্র-ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন; এইরূপে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয়বিধ ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়। এটীও অনুমান। এই অনুমানদ্বয়ের মধ্যে কোনটী সত্য নির্ণয় করা দুরূহ।

এই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয়বিধ ব্রাহ্মণেরাই সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ক্রমে বেদানভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। সুতরাং বঙ্গে আবার বেদ-পারগ ব্রাহ্মণের আগমন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। এই সময় দ্রাবিড় হইতে একদল দাক্ষিণাত্য বৈদিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা বঙ্গে আসার আগে উৎকলে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরাও ক্রমে বেদানভিজ্ঞ হইয়া উঠেন। সুতরাং আবার একদল বৈদিক পশ্চিম হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হয়েন। এইরূপে বঙ্গে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য দুই শ্রেণীর বৈদিকের আবির্ভাব হয়।

ইহার পর পশ্চিম হইতে বঙ্গে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদিগের লক্ষ্য বাণিজ্য। ইঁহারা বাণিজ্য দ্বারা ক্রমে ধনবান্ হইয়া স্বদেশের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানেই অবস্থিতি করেন। ইঁহারাই পাশ্চাত্য বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হয়েন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজত্ব কালে বঙ্গে একটী প্রকাণ্ড সমাজসংস্কার আরদ্ধ হয়। নানাজাতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহাতে আদান প্রদান প্রচলিত হয় মহারাষ্ট্রীয়েরা তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে বিভিন্ন-জাতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে আদান প্রদান আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ে ইহাতে তাঁহাদিগের গৌরব-লাঘব না হইয়া বরং গৌরব-বৃদ্ধিই হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় প্রাদুর্ভাবের অন্তর্ধানের সহিত তাঁহাদিগেরও গৌরবরবি ক্রমে অস্তমিত হইল। ক্রমে সেই সংস্কারকেরা "মধ্যশ্রেণী" এই অশ্রদ্ধেয় আখ্যা প্রাপ্ত

হইতে লাগিলেন। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে অদ্যাপি এই শ্রেণীর কতকগুলি ব্রাহ্মণের বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে বোধ হয় সমস্ত বঙ্গদেশ এই শ্রেণীর লোকে পরিব্যাপ্ত হইত এবং তাহা হইলে তাঁহারা "মধ্যশ্রেণী" নামে আখ্যাত না হইয়া "উত্তম শ্রেণী" নামে আখ্যাত হইতেন। আধুনিক সমাজ-সংস্কারকেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিলে বঙ্গের বৈবাহিক সীমা যে অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এইরূপে বঙ্গে ক্রমে—সপ্তসতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, পাশ্চাত্য ও মধ্যশ্রেণী এই ছয় প্রকার ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল।

এক্ষণে ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ প্রবাদ আছে যে ভগবান্ ভৃগুনন্দন পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। পৃথিবী এইরূপে ক্ষত্রিয়-শূন্য হইলে ক্ষত্রিয়-পত্নীরা বংশরক্ষার্থ ব্রাহ্মণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লয়েন সুতরাং এক্ষণকার ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয় জাতির ক্ষেত্রে উৎপন্ন। আর এক-জাতীয় ক্ষত্রিয় আছেন যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁরা রাজপুত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই দুই দল ক্ষত্রিয়ই বঙ্গদেশে বিরল প্রসর। সুতরাং এস্থলে ইহাঁদিগের সবিশেষ উল্লেখ করা গেল না।

বৈশ্যজাতি—ইহাঁরাও দ্বিজাতি-মধ্যে গণ্য। ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার প্রায় ক্ষত্রিয়-সদৃশ। ইহাঁদিগের জাতীয় ব্যবসায় কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার। ইহাঁদিগের সাধারণ নাম বণিক্। বঙ্গদেশে ইহাঁরা প্রায় সুবর্ণ-বণিক্ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই সুবর্ণ-বণিকেরা এক্ষণে কর্ম্মদোষে শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের নিম্নেই শূদ্র ও বর্ণসঙ্করের প্রাদুর্ভাব।

শূদ্রদিগের মধ্যে কায়স্থ প্রধান। কায়স্থেরা উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র—প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। লাল মোহন বাবুর কায়স্থ-প্রকরণ অতিশয় জটিল ও অপরিস্ফুট। ইহ

আলোচনা ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রস্তাব অতিশয় বাড়িয়া যায়; এই জন্য আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম।

পূর্ব্বোক্ত নানা জাতির পরস্পর-সংমিশ্রণে যে বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বঙ্গীয় সমাজের একটী বিস্তৃত অঙ্গ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। লালমোহন বাবু বলিয়াছেন যে, এই বর্ণ-সঙ্কর সকল স্থলেই বিশুদ্ধ শূদ্র অপেক্ষা নীচ। একথা আমাদিগের সমীচীন বোধ হয় না। কারণ আমরা দেখিতে পাই উচ্চ শ্রেণীর বীজে ও নিম্নশ্রেণীর ক্ষেত্রে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা উচ্চ শ্রেণীর সমকক্ষ না হউক, নিম্নশ্রেণীর অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত হয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এবিষয়ে বৈদ্য ও উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি আমাদিগের নিদর্শন।

গ্রন্থের উপসংহারকালে লালমোহন বাবু পঞ্চগোত্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের বর্ত্তমান সন্ততিগণের যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষ উপাদেয়। কুলীন ব্রাহ্মণমাত্রেরই এই জন্য এক খণ্ড করিয়া লালমোহন বাবুর সম্বন্ধনির্ণয় রাখা উচিত। এমন অনেক কুলীন আছেন, যাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের কোন বৃত্তান্তই অবগত নহেন। যে পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণগরিমায় তাঁহারা অদ্যাপি সমাজে সবিশেষ আদরণীয় হইতেছেন, তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত না হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে লালমোহন বাবু যেরূপ অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত এই সকল বিষয়ের সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বঙ্গবাসিমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। এই বিপ্লবের সময় এ গুলি সংগ্রহ করিয়া রাখায়, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথ সুগম হইয়া রহিল।

পলাশীর যুদ্ধ।*

নবীন বাবুর কবিত্বশক্তি পূর্ব্বেই তাঁহার অবকাশ-রঞ্জিনীনাম অপূর্ব্ব গীতিকাব্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এখানি তাঁহার কবিত্বশক্তি দ্বিতীয় বিস্ফুরণ। সুপ্রসিদ্ধ পলাশীযুদ্ধের ঘটনা অবলম্বন করি এখানি মহাকাব্যের আকারে সংরচিত হইয়াছে। কিন্তু মহাকাবে জন্যে যে সকল উপকরণ-সামগ্রীর প্রয়োজন ইহাতে সে সকল ন বলিয়া ইহাকে আমরা মহাকাব্য বলিতে পারিলাম না। বাইরণে চাইল্ড হেরল্ড, এবং কালিদাসের মেঘদূত প্রভৃতির ন্যায় ইহা কত গুলি খণ্ড কাব্যের সংগ্রহ মাত্র। মিল্‌টনের প্যারাডাইস লষ্ট— ডান্টের হেল্ প্রভৃতি মহাকাব্যের ন্যায় ইহাতে অলৌকিকী সৃষ্টি অমানুষী কল্পনা নাই। হোমরের ইলিয়ড্, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসে মহাভারত, এবং কালিদাসের রঘুবংশ প্রভৃতির ন্যায় ইহাতে পরস্প সম্বন্ধ ঘটনাবলী নাই। ইহাতে কতকগুলি হৃদয়ভাব, কতকগু চিন্তা, এবং দুই একটী ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে মাত্র

কিন্তু যদিও ইহা একখানি মহাকাব্য নহে, তথাপি ইহা যে এ খানি বঙ্গভাষার অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খণ্ডকাব্য তদ্বিষয়ে আ সন্দেহ নাই। ইহার যে স্থানেই আমরা পাঠ করি, সেই স্থানেই আম দের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠে, যেন তালে তালে নাচিতে থাকে ইহা পাঠ করিয়া আমাদের অন্তর্নিগূহিত হৃদয়ভাব যেন উদ্বোধি হয়, আমাদের চির-দাসত্ব-প্রপীড়িত হৃদয়ের শুষ্ক-প্রায় আশালতা যে আবার অঙ্কুরিত হয়। রাজনীতি-গর্ব্বিতা রাজ্ঞী এলিজেবেথ্! রা ক্যাথেরাইন্! তোমরা শুন পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবকে সাহায্য ক ম্বন্ধে আমাদের রাণী ভবানীর কি মত?

---

*শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র।

"রাণীর কি মত?" শুনি সুপ্তোত্থিতা প্রায়,
বলিতে লাগিলা রাণী ভবানী তখন ;—
"আমার কি মত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়!
শুনিতে বাসনা যদি, বলিব এখন,
যেই কাল রঙে সবে চিত্রিলা নবাবে,
জানি আমি এই চিত্র অতি ভয়ঙ্কর,
যতই বিকৃত কেন নিকৃষ্ট স্বভাবে
কর চিত্র, ততোধিক পাপাত্মা পামর;
রে বিধাতঃ! কোন্ জন্মে করেছি কি পাপ?
কোন্ দোষে সহে বঙ্গ এত মনস্তাপ?

"সহজে অবলা আমি দুর্ব্বল-হৃদয়,
নৃপবর! কি বলিব? কিন্তু,—এ চক্রান্ত
কৃষ্ণনগরাধিপের উপযুক্ত নয়;
কেন মহারাজ! এত হইলেন ভ্রান্ত?
কাপুরুষ-যোগ্য এই হীন মন্ত্রণায়
কেমনে দিলেন সায়, এক বাক্যে সব
বুঝিতে না পারি আমি না বুঝিনু হায়!
ভবাদৃশ বীরগণ,—বীরবংশোদ্ভব—
কেমনে এ হীন মন্ত্রে হলে উত্তেজিত,
আমি যে অবলা নারী আমার ঘৃণিত।"

"লক্ষণসেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্লেশ; তবে জানিনে কেমনে
তোমাদের ঘৃণাস্পদ এই মন্ত্রণায়
ফলিবে সুফল পরে? ভেবে দেখ মনে
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতাধিক হন অত্যাচারী—
ইংরাজ সহায় তাঁর—কি করিবে তবে?
এ পাণ্ডিত্য আমি নারী বুঝিতে না পারি।

বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন,
দাসত্বের পারবর্ত্তে দাসত্ব স্থাপন।"

"মহারাজ! একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিগে কর দরশন,
মোগল-গৌরব-রবি আরঙ্গ্‌জিব সনে,
অস্তমিত; নহে দূর দিল্লীর পতন;
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাসি-বিক্রম
হতবল, মহাবল ক্লাইবের করে;
বঙ্গদেশে এই দশা—ব্রিটিশ-কেতন
উড়িছে গৌরবে ফ্রেঞ্চ দুর্গের উপরে;
ক্ষুব্ধ সিংহ, প্রতিদ্বন্দ্বী যূথপতি-বরে
আক্রমিবে কোন মতে, বসিয়া বিবরে

"চিন্তে মনে মনে যথা; ক্লাইব তেমতি
আক্রমিতে বঙ্গেশ্বরে ভাবিছে সুযোগ,
তাহাতে তোমরা যদি সহ সেনাপতি,
দেও তাঁরে, তবে তাঁর প্রতাপ অমোঘ
হইবে অপ্রতিহত; সে ভীম অনল
জ্বলিবে সমস্ত বঙ্গে পতঙ্গের মত
পুড়াবে নবাবে—মিরজাফরের বল
কি সাধ্য নিবাবে তারে? হবে পরিণত
দাবানলে; না পারিবে এই ভীমানল,
সমস্ত জাহ্নবীজল করিতে শীতল।"

"বঙ্গদেশ তুচ্ছ কথা—সমস্ত ভারতে
ব্রিটিশের তেজোরাশি যদ, অতঃপর
কে পারিবে নিবারিতে? কে পারে জগতে
নিবারিতে সিন্ধুচ্ছ্বাস, বন্যা ভয়ঙ্কর?
আছে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিক্রমে যাহার
মোগল-সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পিত,

দস্যুব্যবসায়ী তারা ; হবে ছারখার
ব্রিটিশের রণদক্ষ সৈনিক সহিত
সম্মুখ সমরে। যেই শশী, তারাগণে
জিনি শোভে, হততেজ ভানুর কিরণে।”

“যেইরূপে যবনেরা ক্রমে হতবল
হইতেছে দিন দিন ; অদৃশ্যে বসিয়া
যেরূপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাতেছে কল
ভারত-অদৃষ্ট-যন্ত্রে ; দেখিয়া শুনিয়া
কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূরিত ?
দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্রপতি
হতেছে বিক্রমশালী, কিছু দিন আর
মহারাষ্ট্র-পতি হবে ভারত-ভূপতি ;
অচিরে হইবে পুনঃ ভারত উদ্ধার ;
সার্দ্ধপঞ্চাশত দীর্ঘ বৎসরের পরে,
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে।”

“বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজবিপ্লব দুর্ব্বার ;
নাহি কার অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতোধীন, দেখি বিধি বিধাতার।
কেন মিছে খাল কেটে আনিবে কুম্ভীরে ?
প্রদানিবে স্বীয় হস্তে স্বগৃহে অনল ?
বরিয়া ক্লাইবে, খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্তবলে, লভিবে কি ফল ?
ঘুচিবে কি অত্যাচার বল নৃপবর !
অধীনতা, অত্যাচার নিত্য-সহচর।”

জ্ঞানহীনা “নারী আমি, তবু মহারাজ !
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ ;

বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন
থামিবে না এইখানে ; হয়ে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র-সৈন্যের ভিতর।
হবে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে,
পরিণাম ভেবে মম শরীর শিহরে।'

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধপঞ্চশত বর্ষ ; এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত।
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।"

বিশেষ তাদের এই পতন সময় ;—
কি পাতশাহ, কি নবাব, আমাদের করে
পুতুলের মত, খুঁজে খোঁজ নাহি হয়,
কে কোথায় ভাসিতেছে আমোদ-সাগরে।
আমাদের করে রাজ্য শাসনের ভার।
কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজ-মন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার?
সমরে, শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায়।
অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয়,
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার-সময়।"

"অন্য ভবে—ইংরাজেরা নবপরিচিত।

ইহাদের রীতি নীতি আচার বিচার
অণুমাত্র নাহি জানি। না জানি নিশ্চিত
কোথায় বসতি, দূর—সমুদ্রের পার।
বানর-ঔরসে জন্ম রাক্ষসী-উদরে,
এই মাত্র কিম্বদন্তী ; আকারে, আচারে,
ভয়ানক অসাদৃশ্য ; বাণিজ্যের তরে,
আসিয়ে ভারতে, এবে রাজ্যের বিস্তার
করিতেছে চারিদিগে ; দুর্দ্দান্ত প্রভাবে,
কাঁপায়েছে বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় নবাবে।”

“বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির সে ভবিষ্যদ্ বাণী
ভুলেছ কি মহারাজ? যদি কোন জন
ইংরাজের তেজোরাশি করিবারে গ্লানি
যোগাত মন্ত্রণা, বৃদ্ধ বলিত তখন ;—
‘স্থলে জলিয়াছে যেই সমর-অনল
নারি নিবাইতে আমি ; তাহাতে আবার
প্রজ্বালিত হয় যদি সমুদ্রের জল,
কে বল এ বঙ্গদেশ করিবে নিস্তার?’
এই সংস্কার তাঁর ছিল চিরদিন
অচিরে ভারত হবে ব্রিটিশ অধীন।

“বাণিজ্যের ব্যবসায়ে নবাব-ছায়ায়,
এতই প্রভাব যার ; ভেবে দেখ মনে
নবাব অবর্ত্তমানে, এই বাঙ্গালায়
কে আঁটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে?
মেঘাবৃত রবি যদি এত তপ্ত হায়!
মেঘমুক্তে হবে কিবা তেজস্বী বিপুল!
স্বাধীনতা-আশালতা মুকুলিত প্রায়,
ভারত-হৃদয়ে যাহা, হইবে নির্ম্মূল
প্রভাব তাহায় ; নাহি জানি অতঃপর

কি আছে ভারত-ভাগ্যে—একি ভয়ঙ্কর !”
কড় কড় মহাশব্দে বিদারি গগন ;
জিনি শত সিংহনাদ সহস্র কামান ;
অদূরে পড়িল বজ্র ধাঁধিয়া নয়ন ;
গরজিল ঘন, ধরা হ'ল কম্পবান্ ।
সেই ভীম মন্ত্র, রাণী ভবানীর কাণে
প্রবেশিল, বলিলেন—“একি ভয়ঙ্কর !
ওই শুন মহারাজ ! বসিয়া বিমানে
কহিছেন সুরীশ্বর দেব পুরন্দর—
‘দুঃখিনী ভারত ভাগ্যে’—অভ্রান্ত ভাষায়
‘লিখেছেন বজ্রাঘাত ভবিতব্যতায়’ ।”
“অতএব মহারাজ ! এই মন্ত্রণায়
নাহি কায ; ষড়যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন ;
শীতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়,
অনল শিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন ?
‘রাণীর কি মত ?’ শুন আমার কি মত—
ইন্দ্রিয়-লালসা-মত্ত সিরাজদ্দৌলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা ! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায় !)
নিশ্চয় প্রকৃত রোগ হয়েছে নির্ণয়,
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয় ।”
“আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ !—
অসহ্য দাসত্ব যদি ; নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে ; যেন পূর্ণ শশী
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে,
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে,
হাসুক উজলি বঙ্গ ;—এই অভিলাষে

কোন্ বঙ্গবাসি-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যুৎবেগে আমার ধমনী।"
"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে ;
সহি কিসে মাতৃদুঃখ ? সত্য সেঠবর !—
'বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন,
হও অগ্রসর, নহে কর পরিহার,
অথবা দাসত্বপঙ্কে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি ! দেখাব—আবার !!"

শুনিলে ! এখন বল দেখি প্রভাব, উৎসাহ, মন্ত্রে আমাদের রাণী আমাদের সমকক্ষ হইতে পারেন কি না ? বল দেখি যদি তিনি হতভাগ্য বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি অসীম সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইতে পারিতেন কি না ? মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ! সেঠবর জগচ্চন্দ্র ! তোমরা যদি রাণী ভবানীর ন্যায় দাসত্বকে অসহ্য ভাবিয়া অসি নিষ্কোষণ পূর্ব্বক সমরসাজে সাজিয়া সম্মুখ রণে প্রবেশ করিতে তাহা হইলে কে না বলিবে যে শত শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যার পর পূর্ণশশিসমা বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা এতদিন উড্ডীন হইয়া বঙ্গীয় আকাশকে উজ্জ্বলিত করিত ? আমরাও রাণী ভবানীর সহিত জিজ্ঞাসা করি—

——————এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসি-রক্ত ধমনী ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ?

নবীন ! আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যেন তোমার রাণী ভবানীর এই বক্তৃতাটী হেমবাবুর ভারত-সঙ্গীতের ন্যায়

কি দরিদ্রের পর্ণশালা কি ধনীর অট্টালিকা ধন্যের সর্ব্বত্র গীত হয়, যেন সর্ব্বত্র স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হয়।

ভারতবাসিগণ! তোমরা যদি অতঃপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া ইহার পরিবর্ত্তে অন্য বিদেশীয় সম্রাট্‌কে ভারতসিংহাসনে বসাইতে চাও তাহা হইলে যেন রাণী ভবানীর এই সারগর্ভ উপদেশটী মনে করো:—

"শীতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়,
অনলশিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন?"

প্রথম সর্গের নবাববিদ্রোহিণী সভা আমাদিগকে মিল্‌টনের প্যাণ্ডিমোনীয়মকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কবি সেই প্যাণ্ডিমোনিয়মের ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া নবাববিদ্রোহিণী সভার যে ছবিটী দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা রাণী ভবানীর বক্তৃতাটী সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছি। এক্ষণে ঈশশত্রু সেটানের ন্যায় জগৎসেঠের ভীষণ প্রতিহিংসা ও অবিচলিত-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক বক্তৃতাংশটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না:—

"কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম,—সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদ্দৌল্লার যদি হয় অনুকূল,
অথবা মানুষ ছার, তুচ্ছ ক্ষীণজীবী,
করেন অভয়দান যদি দেবকুল,
তথাপি—তথাপি এই কলঙ্কের কালি
সিরাজদ্দৌল্লার রক্তে ধুইব নিশ্চয়;
যা থাকে কপালে, আর যা করেন কালী
কঠিন পাষাণে দেখ বেঁধেছি হৃদয়;
সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিমা,
অসম্ভব, হবে লুপ্ত সেঠের গরিমা।"
"যেই প্রতিহিংসা-অগ্নি—তীব্র দাবানল,
জ্বলিছে হৃদয়ে মম; প্রতিজ্ঞা আমার,

সিরাজদ্দৌলার তপ্ত শোণিত তরল,
নিভাইবে সে অনল ; কি বলিব আর ?
সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্রমণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল,
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ,
সহস্র হতেও তবু নাহি পরিত্রাণ।”
“বঙ্গমাতা-উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার,
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন ;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ ;
আমি এ কলঙ্ক-ডালি লইয়া মাথায়,
দেখাব না মুখ পুনঃ স্বজাতি-সমাজে ;
সঁপেছি জীবন মম এই প্রতিজ্ঞায়,
কথায় যা বলিলাম দেখাইব কাযে ;
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার
প্রতিহিংসা বিনে মম কিছু নাই আর।”

বঙ্গবাসী ! ভীরু ! দৃঢ়তাবিবর্জ্জিত ! দাস ! যদি তোমাদের শরীরে মনুষ্যত্ব থাকে যদি তোমাদের ধমনীতে আর্য্যশোণিত একদিনও প্রবাহিত হইয়া থাকে, যদি তোমাদের উন্নতির দিকে বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি থাকে, তবে তোমরা জগৎসেঠের নিকট অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ও ভীষণ প্রতিহিংসা অভ্যাস কর। সেই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিহিংসা সাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে আকাশ হইতে নক্ষত্রমণ্ডল এবং পৃথিবী হইতে গগণস্পর্শিনী গিরিরাজি উৎপাটিত করিয়াও সিন্ধুজলে ভাসাইয়া দেও এবং বক্ষঃস্থল পাতিয়া ইন্দ্রের বজ্র গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত হও। এই প্রতিজ্ঞা সংসাধনে জীবন সমর্পণ কর, কথায় বলিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা কর।

এই নিভৃতগাথার প্রত্যেক সর্গের চিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা স্থানাভাবে সকল চিত্র গুলি এখানে তুলিতে পারিলাম না। আশা করি পাঠকগণ আপনারা সেই গুলি পাঠ করিয়া অসীম আনন্দ লাভ করিবেন।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভেই কাটোয়ায়—ব্রিটিস-শিবির বর্ণন। ইহার প্রথম শ্লোকটী অতি রমণীয় হইয়াছে:—

দিবা অবসান-প্রায়; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি, সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর-তরুরাজি-শিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে; নিচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কলকলে, মন্দ সমীরণ,—
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন:—

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥

"অথবা যেমন হিরকশলাকা দ্বারা বিদ্ধ মণিতে অতি কোমল সূত্রেরও গতি অসম্ভব নয়, সেইরূপ বাল্মীক্যাদি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কৃতবাগ্দ্বার রঘুবংশরূপ দুরূহ বিষয়ে মাদৃশ মূঢ়মতিরও প্রবেশ দুঃসাধ্য নহে।" বাস্তবিক প্রাচীন কবিগণ যে সকল বিষয়ে পুনঃ পুনঃ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ে কবিত্ব প্রদর্শন করা নবীন কবির পক্ষে দুরূহ ব্যাপার নহে। কিন্তু যে পথ অদ্যাপি অক্ষুন্ন রহিয়াছে, যাহাতে কোন মহা কবি অদ্যাপি বিচরণ করেন নাই, সেই নবাবিষ্কৃত পথে বিচরণ করা সামান্য সাহসের কাষ নয়। অদ্যাবধি

বঙ্গভাষায় যত কাব্য রচিত হইয়াছে, সে সমস্তই প্রায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির বিষয়ীভূত প্রাচীন ঘটনাবলীর মন্থনের ফল। কোন আধুনিক প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় অধিক কাব্য সংরচিত হয় নাই। নবীন বাবু বঙ্গ কাব্যকাননের এই অভাবটী মোচনের জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আমাদের নবীন কবি এই নবীন পথে বিচরণ করিতে যাওয়ার অসম-সাহসিকতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই নূতন পথে বিচরণ জন্য কবির মনে যেরূপ ভয় ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তিনি দ্বিতীয় সর্গের "আশা" নামক প্রসঙ্গে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ,
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি ;
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি ?
বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি।
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি বল, কুহকিনি!
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত ?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।
কোন্ পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি, গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে,
দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য ধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ ? কিম্বা অসম্ভব
নহে কিছু হে দুরাশে ! তোমার মায়ায় ;
কত ক্ষুদ্র নর ধরি পদচ্ছায়া তব
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায় ;

অতএব দয়া করি কহ, দয়াবতী!
কি চিত্রে রঞ্জিব আজি শ্বেত সেনাপতি?

কবি ক্লাইবের যে চিত্রটি দিয়াছেন তাহা অতি গম্ভীর ও সাহস-ব্যঞ্জক। ক্লাইব পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে ভয় ও আশায় চিন্তা-অবসন্ন মনে নিমীলিত নেত্রে আসনে বসিয়া আছেন এমন সময় :—

অকস্মাৎ চারিদিগে ভাসিল সত্বরে
স্বর্গীয় সৌরভরাশি; বাজিল গগনে
কোমল-কুসুম-বাদ্য; সঙ্গীত তরল;
সহস্র-ভাস্কর-তেজে গগন প্রাঙ্গন
ভাতিল উপরে, নিম্নে হাসিল ভূতল,
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগন,
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখন,
জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।
যুবতীর শুভ্র কান্তি, নয়ন-নীলিমা,
রঞ্জিত ত্রিদিব-রাগে অলক্ত অধর,
রাজরাজেশ্বরীরূপ, অঙ্গের মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন নর চিত্রকর!
শ্বেতাঙ্গ সজ্জিত শ্বেত উজ্জ্বল বসনে,
খেলিছে বিজলী, বস্ত্র অমল ধবলে,
তুচ্ছ করি মণিমুক্তা পার্থিব রতনে,
ঝলিছে নক্ষত্র রাজি বসন-অঞ্চলে।
বেশ ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মত,
স্বর্গীয় শোভায় কিন্তু উজ্জ্বল সতত।
অর্দ্ধ-অনাবৃত পীন পূর্ণ পয়োধর,
তুষার উরস, স্বচ্ছ স্ফটিক আকার,
দেখাইছে রমণীর অমল অন্তর—
চির-প্রসন্নতা-ময়, প্রীতিপারাবার।
নহে উপমেয় সেই বদনচন্দ্রমা,

—কিম্বা যদি দেখিতাম শিখিতাম তবে—
স্বর্গীয়-শারদ-শশী সে মুখ-সুষমা ;
বিশ্ববিমোহিনী আহা! অতুলিত ভাবে।
বসন্তরূপিণী ধনী ; নিশ্বাস মলয় ;
কোকিল কোমল কণ্ঠ ; নেত্র কুবলয় ;
কোটি কহিনুরকান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন, সেই বরাননে ;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে,
কনক-অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম সৌরভ
ঘ্রাণে মর অমরতা করে অনুভব।
ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,
জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল ;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চির-প্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ জিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা,
যেমন প্রখরতেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃত-মাখা পূর্ণমধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে।

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা—'কিভয় বাছনি'—
রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্ন পবনে।

বহিল উল্লাসে মাতি, সেই কণ্ঠধ্বনি
শুনিতে জাহ্নবীজল বহিল উজান ;
অচল হইল রবি অস্তাচল-শিরে,
মুহূর্ত্ত করিতে সেই স্বরসুধাপান ;
সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের ; বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনী-স্রোতে ; বাজিল অমনি
প্রথ হৃদয়ের যন্ত্রে,—"কি ভয় বাছনি !"
"ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি সুভাগিনী
লক্ষ্মীকুললক্ষ্মী আমি, শুন বীরমণি !
রাজলক্ষ্মী মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদরিণী
বিধাতার ; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে
আমি চিরগৌরবিণী ; ত্রিদিবে বসিয়া
কটাক্ষে জানিতে আমি পারি এই ভবে
কখন কি ঘটে ; দেখি অদৃশ্যে থাকিয়া
পার্থিব ঘটনাস্রোত ; চিন্তি অনিবার
ইংলণ্ডের রাজ্যস্থিতি, উন্নতি বিস্তার ।"
"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন .
আসিনু পৃথিবীতলে, তোমারে, বাছনি !
শুনাইতে ভবিষ্যত বিধির লিখন ;—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি ।
এই হতে ইংলণ্ডের উন্নতি নিয়তি ;
এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য ভাস্কর ;
মধ্যাহ্ন গৌরবে যবে ব্রিটন ভূপতি
উজলিবে দশদিক্ দেশ দেশান্তর ;
তাঁর পুত্র-ছায়াতলে জানিবে নিশ্চিত,
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত ।"
"সোণার ভারতবর্ষে, বহু দিন আর,

মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাসী দুর্জ্জয়
করিবে না রক্তপাত ; দ্বিতীয় 'বাবর'
ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন ;
কিম্বা অতিক্রমী দূর হিমাদ্রি-কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডাররাশি করিতে লুণ্ঠন
ভীম বেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর,
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত-প্রায়,
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।"
"অজ্ঞাতে ভারতক্ষেত্রে কিছু দিন পরে
যেই মহাশক্তি বাঞ্ছা করিবে প্রবেশ,
মেষবৎ শৃঙ্খলিবে দিল্লীর ঈশ্বরে ;
তেয়াগিয়া রঙ্গভূমি, ছাড়ি রণবেশ
ভয়ে মহারাষ্ট্র-সিংহ পশিবে বিবরে !
যেমতি উঠিতে থাকে গগণ-উপরে,
ততই পাদপছায়া হয় খর্ব্বাকার ;
তেমতি এ শক্তি যত হইবে প্রবল,
ভারতে ফরাসি তত হবে হতবল।"
"তুমি সে শক্তির মূল আদি অবতার ;
হইওনা চমৎকৃত, ভেবোনা বিস্ময়,
ভারত-অদৃষ্টচক্র, কৃপাণে তোমার
সমর্পিত ; যেই দিকে তব ইচ্ছা হয়,
ঘুরিবে ফিরিবে চক্র তব ইচ্ছামত।
বঙ্গে যেই ভিত্তি-ভূমি করিবে স্থাপন,
সময়েতে তদুপরি, ব্যাপিয়া ভারত
অটল অচল রাজ্য হইবে স্থাপন।
বিধির মন্দির হতে আনিয়াছি আজি,
ভারতবর্ষের ভাবি মানচিত্রখানি।"

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ উর্দ্ধ শিরে পরশে গগণ ;
অদ্রির উপরে অদ্রি অদ্রি তদুপরে,
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ ;
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
—উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি উর্ম্মি তদুপর —
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে ;
অচল পর্ব্বত-শ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধুপরে।"
"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায় ,
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে ;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে,
বিংশতি ব্রিটন নাহি হবে সমতুল ;
তথাপি হইবে—আর নাহি বহু দিন ;
অভাগিনী প্রতি বিধি চির-প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র, ব্রিটন-অধীন।
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায় ?
"ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথী তীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবী রাজধানী ;
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র-কুটীরে,
শোভিবে অমরাবতী রূপে করি গ্লানি
রাজহর্ম্ম্যে, দৃঢ় দুর্গে, প্যালেস মালায়।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা শিরে
ব্রিটিস পতাকা; যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবন সনে অতি ধীরে ধীরে ;

তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে ব্রিটিস রাজ্য করিবে স্থাপন।"

"নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্নসিংহাসনে;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায়;
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মত,
তোমার নিশ্বাসে এই ভারত ভিতরে
কত রাজ্য, রাজা, হবে আনত উন্নত;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে সমরে;
প্রণমিবে হিমাচল সহিত সাগর,—
ইংলণ্ডের প্রতিনিধি,—ভারতঈশ্বর।"

"শতেক বৎসর রাজ্যবিপ্লবের পরে
ইংলণ্ডের সিংহাসন হইবে অচল;
উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবলগিরি, সমুদ্রের তল;
কঙ্কালাবশিষ্ট পূর্ব্ব নৃপতি সকল,
ঘুরিবে বেষ্টিয়া সৌর উপগ্রহ মত;
আও রাহুগ্রস্ত হয়ে দুর্দ্দান্ত মোগল,
ছায়া কিম্বা স্বপ্নে শেষে হবে পরিণত;
বিক্রমে শার্দ্দূল, মেষ, অহিংস অন্তরে,
নির্ভয়ে করিবে পান, একই নির্ঝরে।"

"ধর বৎস! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত; ব্রিটিসের রাজ্য নিদর্শন;
যত দিন পূর্ব্ব রাজ্যে ব্রিটিস শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
তত দিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়;
এই মহারাজনীতি মোহান্ধ যবন

ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয় ;
এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন।
ভীষণ সংহার-অসি, রাজ্যের উপরে
ঝোলে হক্ষ ন্যায়-সূত্রে, বিধাতার করে।"

"যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী,—চিরপরাধীন—
লয়েছে আশ্রয় তব ; দমি অত্যাচারী,—
যেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাশে আসীন,
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে,—
শান্তির শারদ শশী করিতে স্থাপন ;
ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে,
উদিবে নিদাঘতেজে ব্রিটিস তপন
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়,
ডুবিবে ব্রিটিস রাজ্য, ডুবিবে নিশ্চয়।"

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর ;
জেতার উপরে জেতা জিতের সহায়,—
আছেন উপরে বৎস! অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্তিমান্ ন্যায়,
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে,
সম ভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে,
সমভাবে সর্ব্বদেশে শ্বেতে ও শ্যামলে।
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল ;
সম্মুখে ভীষণ, বৎস! শমনায় স্থল।"

দৃপ্ত ব্রিটনগণ! ইংলণ্ড-রাজলক্ষ্মীর এই গভীর উপদেশগুলি যেন তোমাদের হৃদয়-ফলকে উজ্জ্বলবর্ণে চির-অঙ্কিত থাকে। যে পরাধীন হতভাগা ভারতবাসী যবনের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আজ তোমাদিগের শরণাপন্ন হইতেছে, যে মুহূর্ত্তে তোমরা সেই আশ্রিত-

জনগণের প্রতি নিদারুণ ব্যবহার আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে ইংলণ্ড-রাজলক্ষ্মী তোমাদিগের নিকট হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবেন, শ্বেতদ্বীপ শ্রীভ্রষ্ট হইবে, তোমরা অনাহারে অকালে কাল-কবলে পতিত হইবে, ভারত-কহিনুর ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুট হইতে খসিয়া ভূতলে পতিত হইবে। ভারতবাসীরা আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে কখন অস্ত্রধারণ করেন নাই। আশ্রয়দাতারাই অত্যাচারী হইয়া একে একে আপন কর্ম্মফলে এই সোণার ভারত-সিংহাসন হারাইয়াছেন!

অদৃশ্য হইলা বামা; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব-কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের; গেল স্বর্গ, এল ধরাতল।
হায়! যথা হতভাগ্য জলমগ্ন জনে,
সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে, সলিল ভিতরে,
শত শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি রাশি নিরখিয়া, মুহূর্ত্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখে বিশ্ব আঁধার কেবল;
অন্তর নয়নে বীর ব্রিটননন্দন
স্বপ্নান্তে আঁধার বিশ্ব দেখিল তেমন।

ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর এই দৃশ্যটী কি রমণীয়! বাঙ্গালা ভাষার অতি অল্প কাব্যে কল্পনার এরূপ অদ্ভুত বিস্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি যে গীত দ্বারা দ্বিতীয় সর্গের পর্য্যবসান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্বাধীন জাতিমাত্রেরই হৃদয়ে বীরত্ব ও স্বাধীনতার ভাব উত্তেজিত হয়; সমরস্পৃহা বলবতী হয়। কিন্তু চির-পরাধীন ভারত-বাসীর অন্তরে সেরূপ ভাব উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন, যখন তাঁহাদিগের জয়স্তম্ভ অষ্টাদশ দ্বীপে নিখাত ছিল, তখন সিংহল যাত্রা কালে তাঁহাদিগের অন্তরে এরূপ ভাব যে একদিন উদিত হইয়াছিল, আর তাঁহারা যে সিংহলে রণযাত্রার সময় এক দিন নিম্নলিখিত-প্রকার গীত গাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই;—

চির-স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে,
নিস্তারা আকাশে যে নিশামণি,
সুখেতে ভারত আনন্দে বিহরে,
বীর-প্রসবিনী ভারতজননী,
যেই নীল সিন্ধু অসীম দুর্জ্জয়,
বিক্রমে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন,
ভারতের কাছে মানি পরাজয়,
সেই সিন্ধু চুমে ভারতচরণ;
ঘোষে সেই সিন্ধু করি দিগ্বিজয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়!"

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ভারতনন্দন;
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।
বহুদূরগত আমেরিকা দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পাশ্চাত্য প্রদেশে,
ভারতের কীর্ত্তি না আছে কোথায়?
পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"।

সম্বল সাহস; সঙ্গী তরবার;
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ডারী;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার;
শয্যা রণক্ষেত্র; ঈশ ত্রাণকারী।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানলসম বিক্রম বিস্তার;
আছে কোন্ দুর্গ? কোন্ অদ্রিপতি?
কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার?

শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"?
আকাশের তলে এমন কি আছে,
ডরে যারে বীর ভারততনয়?
কেবল ভারতললনার কাছে,
সে বীরবৃন্দের মানে পরাজয়;
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে,
স্মরিয়া অন্তরে; চল রণে তবে;
হায়! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শুনে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে,
গাবে বামাকণ্ঠ-স্বর করি লয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"।
অতএব সবে অভয় অন্তরে,
চীত হয়ে পড়ে দাও দাড়ে টান,
ভারতের পুত্র রণে নাই ডরে,
খেলার সামগ্রী খড়্গ ধনুর্ব্বাণ;
ভারতের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয়;
কিছার দুর্ব্বল সিংহলভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয়;
গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,
"জয় জয় জয় ভারতের জয়"।

কবি তৃতীয় সর্গে যে প্রণয়বিষাদ গীতটী বামার বদন হইতে উদ্গীত করিয়াছেন, পাঠক! অনন্যমনে তাহা একবার শ্রবণ করুন। শুদ্ধ আমাদিগের অনুরোধ নয় কবিরও অনুরোধ;—

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল?
ডুবিলে অতলজলে, তবে প্রেমরত্ন মিলে,

কারো ভাগ্যে মূর্চ্ছা ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুত-প্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
নরশমে অনুপম,
পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়,
পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ-অনলে ক্রমে,
কালি হবে অশ্রুজল।

রমণীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত অশ্রুজল সহিত এই
গান শ্রবণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার—
নির্ব্বাসিত কামানল হলো উদ্দীপন,
গগনেতে কাল মেঘ হইল উদয় ;
উছলিল সিন্ধু : মত্ত হইল যবন।
সুপ্ত বাসনার স্রোত হইয়া প্রবল
ছুটিল ভীষণ বেগে, চিন্তার বন্ধন
কোথায় ভাসিয়া গেল ; হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন :
মুছাইতে অশ্রু কর করিল বিস্তার,
"ক্রম্" কোরে দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার।

এই ভীষণ তোপধ্বনি শ্রবণ করিয়া নবাবের—
ঘুরিল মস্তক, ভয়ে লুকাল অনঙ্গ
শিরস্ত্রাণ পড়ে ভূমে দিল গড়াগড়ি ;

যবনরাজ ক্ষণকাল নীরবে ভ্রমণ করিয়া গবাক্ষে বাহু করিয়া অনতিদূরস্থিত শত্রুশিবিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি অমনি :—

চমকিল অকস্মাৎ, ঝরিল ধরায়
একটী অশ্রুর বিন্দু; একটী নিশ্বাস
বহিল ;—
প্রবল ঝটিকা-শেষে জলধি যেমন
ধরে সুপ্রশান্ত ভাব, উন্মত্ত তরঙ্গে
কিছুক্ষণ করি বেগে সিন্ধু বিলোড়ন,
ক্রমশঃ বিলীন হয় সলিলের সঙ্গে ;
তেমতি নিশ্বাস শেষে নবাবের মন
হইল অপেক্ষাকৃত স্থির সুশীতল ;
মুহূর্ত্তেক মনোভাব করি নিরীক্ষণ
বলিতে লাগিল ধীরে চাহি ধরাতল।
"কেন আজি মন মম এত উচাটন ?
বোধ হয় বিষে মাখা সকল সংসার !
কেন আজি চিন্তাকুল হৃদয় এমন ?
কেমনে হইল এই চিন্তার সঞ্চার ?
বিধবার অশ্রুধারা, অনাথ-রোদন,
সতীত্বরতন-হারা রমণীর মুখ,
নিদারুণ যাতনায় যাদের জীবন
বধিয়াছি, নিরখিয়া তাহাদের মুখ,
হর্ষ-বিকসিত হতো যাহার বদন,
তার কেন আজি হলো সজল লোচন ?"

সিরাজ দেখিলেন যেন শিবিরে প্রত্যেক আলোকের নিকট তাঁহার নিদারুণ অত্যাচার সকল চিত্রিত রহিয়াছে। দৃষ্টিবিভ্রম মনে করিয়া রুমালে দুনয়ন মুছিতেছিলেন ;—

কিন্তু হৃদয়েতে যেই কলঙ্ক বিষম,
ঘুচিবে সে দোষ কেন মুছিলে নয়ন ?
পরিষ্কারি নেত্রদ্বয় দেখিলে আবার,
সেই চিত্র স্পষ্টতর দেখে পুনর্ব্বার !

দেখে বিভীষিকা মূর্ত্তি ভয়াকুল মনে,
নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে,
প্রত্যেকে একটী পাপ চিত্রিয়া গগনে,
দেখায় প্রত্যেক তারা বিবিধ বিধানে।

কি গভীর অনুতাপ! কি হৃদয়দ্রবকারিণী অনুশোচনা! সিরাজ আবার বলিতে লাগিলেন :—

"এই বঙ্গরাজ্যে অতি দীন নিরাশ্রয়
যেই সব প্রজাগণ, সারা দিন হায়
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ক্লান্ত অতিশয়;
অনশনে তরুতলে ভূতল-শয্যায
করিয়া শয়ন, এই নিশীথে নির্ভয়ে,
লভিছে আরাম সুখে তারাও এখন।
আমি তাহাদের রাজা, আমি এ সময়ে
সুবাসিত কক্ষে কেন বসিয়া এখন?

কি শোচনীয় অবস্থা! অত্যাচারী রাজার পরিণাম প্রায় এই রূপই হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বলে ও অত্যাচারে ভারত শাসন করিতে উপদেশ দেন, তাঁহাদিগের নয়নসমক্ষে সিরাজদ্দৌলার জীবনের এই শেষ চিত্রটী ধরিয়া দেওয়া উচিত। দুর্ব্বল ভারতবাসী যেন অন্যায় ও অত্যাচারেও তাঁহাদিগের পদানত হইয়া রহিল, তাহারা যেন অন্তরের যাতনা অন্তরেই নিগূহিত করিল, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহাদিগের মুক্তি? কখনই নহে—শক্তি থাকিতে না হউক, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে—যখন তাঁহাদিগের দৃষ্টি ও নাড়ী ক্ষীণ হইবে—তখনও অন্ততঃ অনুতাপানলে তাঁহাদিগের হৃদয় দগ্ধ হইবেই হইবে; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সিরাজদ্দৌলার এই গভীর অনুতাপ আমাদিগকে ম্যাক্‌বেথ ও লেডি ম্যাক্‌বেথের শেষাবস্থা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

সিরাজদ্দৌলার প্রতিহিংসাবৃত্তিও ম্যাক্‌বেথের প্রতিহিংসাবৃত্তির ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্কর। তিনি সেনাপতি মিরজাফরকে অবিশ্বাসী ও

আততায়ী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

এখন কোথায় যাই কি করি উপায় ?
বিশ্বাসঘাতকী হায় ডুবালে আমায় ;
যদি কোন মতে কালি পাই পরিত্রাণ,
মিরজাফরের সহ যত বিদ্রোহীর,
মনোমত সমুচিত দিব প্রতিদান,
বাঁধব সবংশে ; আগে যত রমণীর
হিতরি সতীত্বরত্ন আপন কিঙ্করে,
তাদের সম্মুখে ; পরে সস্ত্রীক সন্তান
কাটিব, শোণিত পিতা পতির উদরে
প্রবেশি বিদ্রোহতৃষা করিবে নির্ব্বাণ :
পরে তাহাদের পালা"—

এই বলিতেছেন এমন সময় তাঁহার নিজ অনুচর শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল। নবাব ইঁহাকে যমদূতস্বরূপ মিরজাফরের দূত মনে করিয়া শিবিরকোণে লুকাইলেন ও ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইলেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার প্রতিহিংসাবৃত্তি যেরূপ প্রবল, বীরত্ব ও সাহস তাদৃশ প্রবল ছিল না। সুতরাং তিনি ম্যাক্‌বেথের ন্যায় সম্মুখ-সমরে শত্রুরুধিরে প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে সাহসী হন নাই। এই জন্য তিনি অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলেন :—

"যা থাকে কপালে, আর অদৃষ্ট ভাবিয়া,
ক্লাইবে লিখিব পত্র, দিব রাজ্য ধন
বিনা যুদ্ধে, যদি রক্ষে আমার জীবন।"

এই কথা বলার পরক্ষণেই তাঁহার মনে ইংরাজদিগের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব উদিত হইল, অমনি বলিয়া উঠিলেন :—

"কি বিশ্বাস ক্লাইবেরে ! নিয়ে সিংহাসন,
নিয়ে রাজ্যভার"—

এইরূপ বলিতেছেন এমন সময় সহসা শিবির-মধ্যে একটী মা
ছায়া পতিত হইল। নবাব শত্রুচর মনে করিয়া লেখনী ফে
পুনর্ব্বার প্রাণভয়ে শিবিরাভ্যন্তরে লুকাইলেন। কিন্তু বেগমের প
চারিকাকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জা ও ঘৃণায় নিপীড়িত হইয়া বলি
লাগিলেন :—

"না—এই যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি,
এখনি পড়িব মিরজাফরের পায়ে,
রাখিয়া মুকুট, রাজদণ্ড তরবারি,
তাহার চরণতলে, পড়িয়া ধরায়
মাগিব জীবন ভিক্ষা ; অন্তরে তাহার
অবশ্য হইবে দয়া"—

নবাব অন্তরে এই ভাবিয়া মন্ত্রীর শিবিরের দিকে উন্মত্তের ন্যা
দৌড়িতেছিলেন, এমন সময় কল্পনাচক্ষে সম্মুখে শত ভীম নরক
দেখিতে পাইলেন। এবং "অবিশ্বাসী! আততায়ী! বধিল জীবন
এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন :—

অমনি বিদ্যুৎ বেগে করিয়া বেষ্টন,
ধরিল রমণীভুজ মৃণাল-যুগলে ;

এক নবাবমহিষী শিবিরের এক পার্শ্বে
পর্য্যঙ্কোপরে বসিয়া প্রথম হইতে—
নবাবের ভাব দেখি বিষণ্ণ অন্তরে
শয্যা ভিজাইতেছিল নয়নবারিতে ;

এখন সহসা—

নবাবে ছুটিতে দেখি উন্মাদ-আকার,
গিয়াছিল বিষাদিনী পশ্চাতে তাহার।

তাহার পর—

কামিনী কোমল স্নিগ্ধ অঙ্গ পরশিতে
কিছু পরে বঙ্গেশ্বর চেতন পাইয়া,

অবোধ শিশুর মত লাগিল কাঁদিতে ;
বিষাদিনী প্রেয়সীর গলায় ধরিয়া ;

* * * *

"একি নাথ !" জিজ্ঞাসিল বিষাদিনী ধনী,
অভাগা অস্ফুটস্বরে বলিল তখন—
"অবিশ্বাসী—আততায়ী বাধল জীবন"
বলিতে বলিতে ক্লান্ত হলো কলেবর :

* * * *

ভাবনায়, অনিদ্রায়, হইয়া অধীর,
অমনি অজ্ঞাতে ধীরে মুদিল নয়ন ;
বিকট স্বপন যত দেখিল নিদ্রায়,
বলিতে শোণিত, কণ্ঠ, শুকাইয়া যায়।

এইরূপে সিরাজ নিদ্রাবস্থায় উপর্য্যুপরি সাতটী স্বপ্ন দেখিলেন। ঐ সকল স্বপ্নে সিরাজকৃত যে সকল লোমহর্ষণ ব্যাপারের ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বাস্তবিকই শোণিত ও কণ্ঠ শুকাইয়া যায়। এরূপ ভয়ঙ্কর কল্পনার বিকাশ আমরা বঙ্গভাষায় অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর করি নাই। ম্যাক্‌বেথে ব্যাঙ্কিওর রুধিরাক্ত প্রেত দেহ কেবল আমাদিগের মনে এরূপ ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব করিয়া দিয়াছিল।

"বহুপত্নীক যবনদিগের স্ত্রীর অন্তরে পতি-প্রেম থাকিতে পারে না" যাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন নিম্নলিখিত চিত্রটী তাঁহাদিগের সেই বিশ্বাসের ভঞ্জন করিয়া দিবে :—

প্রেমপূর্ণ স্থিরনেত্রে আনত বদনে,
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ-পানে ;
বিলম্বিত কেশরাশি, আবরি আননে
পড়িয়াছে পতিবক্ষে, শয্যা- উপাধানে ;
এক ভুজবল্লী শোভে পতি-কণ্ঠতলে,
অন্য করে মুছে নাথ বদন-মণ্ডল ;
থেকে থেকে তিতি বামা নয়নের জলে,

প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল ;
মুছাইতে স্বেদবিন্দু, বামার নয়ন
অমর দুর্লভ অশ্রু করিছে বর্ষণ।
নির্জ্জন কাননে বসি জনকনন্দিনী,
—নিদ্রিত-রাঘবশ্রেষ্ঠ-উরুউপাধানে—
কেঁদেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী,
চাহি পথশ্রান্তে পতি নরপতি পানে ;
অথবা বিজন বনে, তামসী নিশীথে,
মৃত পতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী,
কেঁদেছিল যেই অশ্রু ; এই রজনীতে
কাঁদিতেছে সেই অশ্রু এই বিষাদিনী ;
তুচ্ছ বঙ্গ-সিংহাসন—এই অশ্রু তরে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপদ অম্লান অন্তরে।"

এদিকে ক্লাইব নিজ শিবিরাভ্যন্তরে বসিয়া অনিদ্রায়, মনের চাঞ্চল্যে, অতি কষ্টে রজনী যাপন করিতেছেন, অনিশ্চিত ভবিষ্যদ্-ভাবনায় থেকে থেকে তাঁহার হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেছে। এত অল্প অদূরদর্শী ও অশিক্ষিত সেনা লয়ে কেমনে অসংখ্য যবন-সেনাকে পরাজয় করিব, কেমনে ক্ষীণ তৃণদল দিয়া অসংখ্য অশনিবৃন্দ কাটিব, যদি রণে পরাজয় হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের সমস্ত আশা বিফল হইবে, দুর্লঙ্ঘ্য সাগর পার হইয়া সংবাদ দিতে একজন ইংরাজও শ্বেতদ্বীপে আর ফিরিয়া যাইবে না—এই সকল গভীর ভাবনায় তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল। তিনি একবার স্থির করিলেন :—

"ফিরে যাই, নাহি কাজ বিষম সাহসে,
স্বইচ্ছায় কে কোথায় ব্যাঘ্রমুখে পশে ?"

আবার রণপরাঙ্মুখতার অবশ্যম্ভাবী বিপদ্ সকল তাঁহার নয়ন-সমক্ষে আবির্ভূত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন :—

"ফিরে যাব ? কোথা যাব ? স্বদেশে আমার ?
বৎসরের পথে বল যাইব কেমনে ?"

ওই ভাগীরথী নদী না হইতে পার,
আক্রমিবে কালসম দুরন্ত যবনে ;
জনে জনে নিজ হস্তে বধিবে জীবনে
অথবা কাঁদিবে বন্দী রাজকারাগারে,
কাঁদি যদি দীনভাবে পড়িয়া চরণে
জীয়ন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে তাহারে ;"

এই ভীষণ পরিণাম ভাবিয়া ক্লাইব স্থির করিলেন—প্রতিজ্ঞা করিলেন :—

"কি কায পলায়ে তবে শৃগালের প্রায়,
যুঝিব, শুইব রণে অনন্ত শয্যায়।
আমরা বীরের পুত্র, যুদ্ধব্যবসায়ী ;
আমাদের স্বাধীনতা বীরতা জীবন ;
রণক্ষেত্রে এই দেহ হলে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন ;
করিব না, করে অসি থাকিতে আমার,
জননীর শ্বেত অঙ্গে কলঙ্ক অর্পণ ;
মরিব, মারিব শত্রু, করিব সংহার,
বলিলাম এই অসি করি আস্ফালন ;
শ্বেতদ্বীপ ! জিনি রণ ফিরিব আবার,
তা না হয়, এই খানে বিদায় সবার !"

ধন্য ব্রিটনন্দন ! ধন্য তোমার সাহস ! ধন্য তোমার বীরত্ব ! তোমার একদিনের সাহসে, তোমার একদিনের বীরত্বে, অনন্তকালের জন্য ভারতকহিনুর ইংলণ্ডেশ্বরীর মস্তক উজ্জল করিল। কিন্তু বীরবর ! তুমি রণে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিতে সেও তোমার ভাল ছিল, তথাপি নীচ মন্ত্রণায় ও জঘন্য ষড়যন্ত্রে কর্ণপাত করিয়া ইংলণ্ডের নিষ্কলঙ্ক যশে কলঙ্কারোপ করা তোমার উচিত ছিল না। যাঁহার অসীম সাহস ও বিপুল পরাক্রম তাঁহার এ সকলে প্রয়োজন কি ?

দ্বিতীয় সর্গের ন্যায় তৃতীয় সর্গও একটী সঙ্গীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এটীত সঙ্গীত নয় যেন প্রেমময় মধুধারা। কোন বিরহবিধুর ব্রিটিস যুবক প্রিয়তমা কেরোলাইনাকে উদ্দেশ করিয়া এই গান গাইয়াছিলেন। ইহার স্থানে স্থানে গোলকণ্ডার হীরকের ন্যায় অমূল্য কবিত্বরত্ন নিহিত আছে।

চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ বর্ণন। ক্লাইব পলাশির আম্রবনে অবস্থিত। রজনী প্রভাতা। অরুণের কিরণজালে অবনীমণ্ডল সুবর্ণময়। কবি এই অবস্থাটী কি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

পোহাইল বিভাবরী পলাশি-প্রাঙ্গনে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী ;
চিত্রিয়া ভারত-ভাগ্য আরক্ত গগনে,
উঠিলেন দুঃখভাবে ধীরে দিনমণি ;
শান্তোজ্জ্বল করুরাশি চুম্বিয়া অবনী,
প্রবেশিল আম্রবনে ; প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ শতদলে ভাসিল অমনি ;
ক্লাইবের মনে হল স্ফূর্ত্তির সঞ্চার ;
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

দিনমণি গগনললাটে উদিত হইতে না হইতেই :—

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন, উঠিল সে ধ্বনি।
নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনী ভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।
নিনাদে সমররঙ্গে নবাবের ঢোল,

ভীমরবে দিগঙ্গনে,
কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে,
উঠিল অম্বরপথে করি ঘোর রোল।
ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে ;
শঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হলো রণস্থল।
অকস্মাৎ একেবারে শতেক কামান,
করিল অনলবৃষ্টি,
যেন বিনাশিতে সৃষ্টি,
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হলো তিরোধান।
অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয়-মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রাখিতে সেনায়।
সম্মুখে সম্মুখে বলি সরোষে গর্জ্জিয়া
করে অসি তীক্ষ্ণধার,
ব্রিটিসের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।
ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।
আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি,
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাজন।
আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।

কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগন।
ছুটিল একটী গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মির্ মদন পতন!

এরূপ ভীষণ যুদ্ধ বর্ণনা আমরা বঙ্গভাষায় আর পাঠ করি নাই। সেনাপতি মিরমদনের মৃত্যুতে নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছিল, এমন সময় বিক্রমকেশরী হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল ক্ষত্রিয়োচিত গাম্ভীর্য্য ও বীরত্বের সহিত বলিতে লাগিলেন :—

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরি, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জ্জিল মোহনলাল "নিকট শমন"
"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন!"
"ভারতে পাবিনা স্থান করিতে বিশ্রাম,
নবাবের মাথা খেয়ে,
কেমনে আসিলে ধেয়ে,
মারিবি মরিবি ওরে যবন-সন্তান!"
"সেনাপতি! ছিছি একি! হা ধিক্ তোমারে
কেমনে বলনা হায়!
কাঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে!"
"ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,

ওই তব সৈন্যগণ,
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ?”
“দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার,
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর ?”
“সামান্য বণিক্ এই শত্রুগণ নয়,
দেখিবে তাদের হায়,
রাজ্য, রাজ্য ব্যবসায়,
বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়” ।
“নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল ভার,
ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয় ।”
“যেই হিন্দু জাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিবে মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত ।”
“বীরপ্রসবিনী যত মোগোলরমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে,
প্রসবিল কুলাঙ্গারে,
চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি ।”
“প্রণয় কুসুম-হার রে ভীরু দুর্ব্বল !
পরাইলি যে গলায়,
বলনা রে কি লজ্জায়
পরাইবি সে গলায় দাসীত্বশৃঙ্খল ।
“কোথায় ক্ষত্রিয়গণ সমরে শমন,

ছিছি ছিছি একি কাজ
ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ,
কেমনে শত্রুরে পৃষ্ঠ করালি দর্শন ?"
"বীরের সন্তান তোরা বীর অবতার ;
স্বকুলে দিলিরে ঢালি,
এমন কলঙ্ককালি,
শৃগালের কায, হয়ে সিংহের কুমার !"
"কেমনে যাবিরে ফিরে ক্ষত্রিয়সমাজে,
কেমনে দেখাবি মুখ,
জীবনে কি আছে সুখ,
স্ত্রীপুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে।"
"ক্ষত্রিয়ের এক মাত্র সাহস সহায়,
সে বীরত্ব প্রভাকরে,
অর্পি ভীরু ! রাহুকরে,
কেমনে ফিরিবি ঘরে কি ছার আশায় ?"
"কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান .
রাখিব রাখিব মান ;
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব সাধিব সবে প্রভুর কল্যাণ !"
"চল তবে ভ্রাতাগণ চল পুনর্ব্বার ;
দেখিব ইংরাজদল,
শ্বেত অঙ্গে কত বল,
আর্য্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার ?"
"বীর-প্রসূতির পুত্র আমরা সকল,
না ছাড়িব একজন,
কভু না ছাড়িব রণ ;
শ্বেত অঙ্গে রক্তস্রোত না হলে অচল।"
"দেখাব ভারতবীর্য্য দেখাব কেমন,

বলে যদি হীমাচল,
করে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটী চরণ।"
"যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়া বলে,
ডুবায় সিন্ধুর জলে,
তথাপি ক্ষত্রিয় দলে,
টলাইতে না পারিবে বলে কি কৌশলে।"
"সহে না বিলম্ব আর চল ভ্রাতাগণ,
চল সবে রণস্থলে,
দেখিব কে জিনে বলে
ইংরাজের রক্তে আজি করিব তর্পণ?

ধন্য মোহনলাল! ধন্য! তুমিই শেষ হিন্দু—যাঁহার মুখে আমরা রূপ অপ্রতিম বীরত্বের পরিচয় পাইলাম! ধন্য নবীন! ধন্য তোমার মৃত্যুনিঃস্যন্দিনী লেখনী। মা ব্রিটনেশ্বরি! হিন্দু সেনাপতির অচলা ভক্তি ও অসীম সাহস অবলোকন করিলে? এক্ষণে অপকটহৃদয়ে ন দেখি কোন্ জাতি হিন্দুজাতির ন্যায় বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী প্রভুর ন্যও সমরে প্রাণ দিতে পারে? বল, মা! এরূপ বিশ্বাস আর কোন নার উপর ন্যস্ত করিতে পার কি না? যদি না পার, তবে সাম্রাট আকবর প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুদিগকে সৈনাপত্যে বরণ না কর কেন? । যদি ভারতসিংহাসন অটল রাখিতে চাও, তবে হিন্দুজাতির উপর ই গুরুভার অর্পণ কর। দেখিবে ইহারা তোমার সহস্র বাহুর কার্য্য রিবে। ভয় করো না মা! নিশ্চয় জেন যে হিন্দুজাতির হৃদয় বিশ্বাস তকতায় কখনই কলঙ্কিত হইবে না। শত সহস্র প্রলোভনও াহাদিগের মনকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

হিন্দুসেনাপতি মোহনলালের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া:—

ছুটিল ক্ষত্রিয়দল, ফিরিল যবন,
যেমতি জলধিজলে,
প্রকাণ্ড তরঙ্গদলে,

ছুটে যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ, অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম-অগ্নি উদ্গীরণ
জলধর মধ্যে যেন অশনি-সম্পাত।
এমন সময়—
অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ,
কর অস্ত্র সম্বরণ,
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

নবাবের এই আকস্মিক ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সৈন্যেরা যেমন হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল,—যেমন তাহাদিগের এক পা উঠিল অমনি :—

ইংরাজ শঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন।
কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়
লাগিল ; শঙ্গিন যায়,
বরিষার ফোঁটাপ্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিসবাজনা,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয়ঘোষণা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্তকায়,
অস্ত গেলা রবি, হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরবভাস্কর!

এইরূপে সহসা যবনিকা পতিত হইয়া বঙ্গরঙ্গভূমিতে যবনদিগের অভিনয়লীলার পর্য্যবসান করিল।

এরূপ আকস্মিক ঘোষণাপত্র প্রচারিত না হইলে এই সমরের কি পরিণাম হইত কে বলিতে পারে?

কবি যে গভীর-শোক-ব্যঞ্জক শ্লোকচয়ে চতুর্থসর্গের পর্য্যবসান করিয়াছেন তাহার দুই একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার রমণীয় কবিত্বশক্তি ও গভীর হৃদয়ভাবের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে:—

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোকসিন্ধু-জলে?
যাও তবে, যাও দেব, কি বলিব আর?
ফিরিওনা পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে;
কি জন্যে বল না আহা ফিরিবা আবার?
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ;
যদবধি হইবে না দাসত্বমোচন,
এস না ভারতে পুনঃ এস না তপন।
এস সন্ধ্যে! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতন-রাজি করে ঝলমল?
কিম্বা শুনে ভারতের দুঃখসমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল,
তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত?
এস শীঘ্র, প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,
লুকাও ভারতমুখ দুঃখে অবনত;
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল;
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন।
সেই দিন যেই রবি গেলা অস্তাচলে,

ভারতে উদয় নাহি হইল আবার ;
পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে,
ঈষদে হাসিতেছিল কটাক্ষ তাহার ;
কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ,
করিল তিমিরাবৃত ভারতগগণ,
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন ?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি-নিয়ম ;
কিম্বা জলধরচ্ছায়া থাকে কতক্ষণ ?
যে আশা ভারতবাসী চিরদিন তরে,
পলাশির রণরক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,
বলে না, স্মরে না, ভেবে ভাবে না অন্তরে ;
কল্পনে, সে কথা মিছে কহ কি কারণ ?
থাকুক পলাশিক্ষেত্র এখন যেমন ;
থাকুক শোণিতসিক্ত হত যোদ্ধৃদল ;
প্রত্যহ ভারত অশ্রু হইয়া পতন,
অপনীত হবে এই কলঙ্ক সকল।

পঞ্চমসর্গে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটী ও পলাশির জেতা ব্রিটিস বীরগণের মদ্যপান-কালীন গীতটী ব্যতীত উদ্ধরণযোগ্য আর কিছুই নাই :—

হায় ! মাতঃ বঙ্গভূমি ! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে ?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়,
পরাণে বধিতে হায় ! মধুমক্ষিকারে,
যদি মকরন্দ নাহি হতো সুধাসার ;
পাইত না অনাহার-ক্লেশ মক্ষিকায়,
স্বর্ণপ্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
উঠিত না বঙ্গে আজি এই হাহাকার !

আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস পাষাণ,
হতে যদি, তবে মাত! তোমার সন্তান
হইত না এইরূপে ক্ষীণ কলেবর;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার;
ধমনীতে প্রবাহিত হতো উগ্রতর
রক্তস্রোত; হতো বক্ষঃ বীর্য্যের আধার;
আজি এই বঙ্গভূমি হইত পূরিত
সজীব পুরুষরত্নে; দিগ দিগন্তর
বঙ্গের গৌরবসূর্য্য হতো বিভাসিত;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হতো অন্যতর,—
কল্পনে! সে দুরাশায় কায নাই আর,
ব্রিটিস শিবির ওই সম্মুখে তোমার!

এত উদাহরণ প্রদর্শনের পর ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে "পলাশির যুদ্ধ" বঙ্গভাষার এক অমূল্য রত্ন। আমরা ইহা হইতে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাই আমাদিগের বাক্যের সত্যতাবিষয়ে স্বাক্ষ্য প্রদান করিবে। উপসংহার কালে আমরা অন্তরের সহিত কেবল এইমাত্র প্রার্থনা করি—যেমন বীরবর সেকন্দরনা আপন উপাধানের অধঃস্থলে একখানি করিয়া হোমরের "ইলিয়ড্" রাখিতেন, সেইরূপ যেন প্রত্যেক বঙ্গবাসী আপন আপন উপাধানের নিম্নে এক খানি করিয়া নবীনের "পলাশির যুদ্ধ" রাখেন; এবং সময়ে সময়ে ইহা পাঠ করেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগের নির্ব্বাণপ্রায় বীর্য্যবহ্নি একদিন অবশ্যই প্রধূমিত হইবে।

ভারত-উদ্ধার।*

বাগ্মীর সুদীর্ঘ বক্তৃতা অপেক্ষা সরস বিদ্রূপে যে অধিক ফল ফলে তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। কি রাজনীতি কি সমাজনীতি ইংলণ্ডে সকল বিষয়েই পঞ্চের (Punch) প্রভাব অনুল্লঙ্ঘনীয়। আমাদিগের দেশে সেরূপ বিদ্রূপাত্মক এক খানি পত্রিকা না থাকায় আমরা বিশেষ অসুবিধা অনুভব করি। বসন্তক ও হরবোলা ভাঁড় এই শ্রেণীর পত্রিকা ছিল বটে, কিন্তু তাহারা অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গীয় সমাজ ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে হৃদয়বেধকারিণী বিদ্রূপোক্তি দ্বারা কুপথ হইতে নিবৃত্ত ও সুপথে প্রবৃত্ত করে এমন এক খানিও পত্রিকা নাই। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য মান্য গণ্য, ধন্য গুণিগণাগ্রগণ্য অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীলশ্রীযুক্ত রামদাস শর্ম্মা বাহাদুর বঙ্গরঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শর্ম্মা মহাশয়ের ভারত-উদ্ধার কাব্য পঞ্চের স্থানীয় নয় বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা যে কিয়ৎ পরিমাণে পঞ্চের অনুষ্ঠেয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কি উপায়ে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া ভারতের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে আজ কাল ভারতের সর্ব্বত্র যুবকমণ্ডলীর মস্তিষ্ক এই চিন্তায় আলোড়িত। চতুর্দ্দিকে সভা সংস্থাপিত হইতেছে। বক্তৃতা-তরঙ্গে ভারতবক্ষ তরঙ্গায়িত হইতেছে। যেন ভারত শ্মশানে নব জীবন সঞ্চার হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া রাম শর্ম্মার মস্তিষ্ক স্থির থাকিতে পারিল না। তিনি সেই যুবক দলের দলনার্থ অগ্রসর হইলেন। এই প্রকাণ্ড মহাকাব্য সেই উপলক্ষেই প্রসূত হইল।

*অথবা চারি আনা মাত্র। (ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা) শ্রীরামদাস শর্ম্মা বিরচিত। গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত।

এক্ষণে কিরূপে এবং কিরূপ লোক দ্বারা ভারতের উদ্ধার সাধন করিবার চেষ্টা হইতেছে রাম শর্ম্মা বিপিনকৃষ্ণ নামক একটী বঙ্গীয় যুবকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা বিশদীকৃত করিয়াছেন। সেই চিত্রটী স্বদেশানুরাগকে অঙ্কুরে বিদলিত করিলেও, কবিত্বাংশে এত সুন্দর হইয়াছে যে নিয়ে প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিপিনকৃষ্ণ কালেজের পড়াশুনা সমাপ্ত করিয়া এক কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু সামান্য অপরাধে সেই কর্ম্ম হইতে তাড়িত হইয়া আফিসে আফিসে ভ্রমণ করিয়া কোন কর্ম্ম কায জুটাইতে পারিলেন না। অবশেষে এক দিন

"ধূলি-ধূসরিত জুতা, মলিন বদন
ফেকো উড়িতেছে মুখে সাধি' জনে জনে"

এই অবস্থায় ব্রাহ্মণীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট খাবার চাহিলেন। ব্রাহ্মণী তাহার উত্তরে বলিলেন :—

"ভস্ম খাও, দগ্ধানন! তোমার কপালে
পড়িয়া সকল সাধ পুরিয়াছে মোর?
আছে মাত্র ছেলে দুটো—সংসার-বন্ধন—
নাহিলে, কলস রজ্জু ক্লেশ অবসান
করি দিত কোন্ কালে। হে অক্ষম নাথ!
দুধের অভাবে বুঝি সে দুটোও মরে।"

ব্রাহ্মণীর বাক্য অসহ্য হওয়ায়, বিপিনকৃষ্ণ যেমন তাহার উত্তরে দুদশ কথা বলিলেন অমনি ব্রাহ্মণী—

"ধরিয়া বিরাট ঝাঁটা প্রহার করিল।"

তখন বিপিনকৃষ্ণ তথায় আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া নিজঘরে পলায়ন পূর্ব্বক অর্গল রুদ্ধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সুরেশ্বরীর উপাসনা করিলেন। অমনি তিনি দিব্য চক্ষু পাইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান রূপে দেখিতে লাগিলেন।

আর এক দিন আষাঢ় মাসের সায়ংকালে বিপিনকৃষ্ণ ভারতবাসীদিগের দুরবস্থার বিষয়ে ভাবিতে ভাবিতে এইরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন :—

-হায়! গত কত দিন
এই ভাবে; আর কত দিন বা সহিব
দারুণ যন্ত্রণা; বঙ্গ, কত কাল র'বে
বঙ্গবাসী-পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে?
আমি ত মরিব আগে, ক্রমে বংশলোপ
এই রূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে?
ভারত কি চিরদিন পরাধীন র'বে?
সুখের চাকুরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে
দশের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল,
পাপিষ্ঠ ইংরেজ! পদে পদে প্রবঞ্চনা
যার, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধরি,
ছুতোনাতা ছলে সর্ব্বনাশ সাধলিল!
ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানা মতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে
জাগাইতে গেনু—ওমা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তা'ও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।
—উপায় কিছুই নাই! কুপোষ্য সুপোষ্য,

পতিপ্রাণা প্রণয়িনী, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এসব ফেলিয়া, দূর দেশান্তরে যাই,
তা'ও ত পারি না প্রাণ থাকিতে এদেহে।
ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
"লাট" পদে অভিষেকি আহার যোগায়।
ভারতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না;
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহা'বে না।
অসহ্য হ'তেছে ক্রমে, রাখিতে পারি না,
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হ'ল রসাতলে।
কুষ ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা;
যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে যদি; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ, লুটে পুটে খাব।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে
—হায় রে লজ্জার কথা, অন্য অস্ত্র নাই!—
—হায় রে দুঃখের কথা, অস্ত্র চালাইতে
শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসী-দেহে!—
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"

এই বলিতে বলিতে বিপিনকৃষ্ণ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। "বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে" ইহাই অবশেষে তাঁহার ধুয়া হইয়া উঠিল। এইরূপে শুধু মুখে পাষণ্ড ইংরাজগণকে বঁটাইতেছেন এমন সময় বিপিনকৃষ্ণের পরমবন্ধু কামিনীকুমার পশ্চাৎ দেশ হইতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিলেন। বিপিনকৃষ্ণ তাঁহাকে পুলিশ কর্ম্মচারী ভাবিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে চেষ্টা করিলেন। কামিনীকুমারও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক [illegible] করিলেন:—

তখন কামিনীকুমার বলিতে [illegible]

"কেন ভাই এত ভয়?
তুমি ত সাহসী বড় বিখ্যাত জগতে,
বাঁধিলে লড়াই আজি দুশ্‌মনের সনে
তুমি অগ্রবর্ত্তী হ'বে? দেশের কল্যাণে
মুণ্ড নিতে মুণ্ড দিতে ভয় নাহি পাও;
তবে এ নগর মাঝে, জাগ্রত সকলে,
সিপাই সন্তরী হেথা ইঙ্গিত করিলে,
কেন হেন ভাব তব হৈল আচম্বিতে?
পড়া শুনা করিয়াছ, কুত নাহি মান,
কেন তবে, হে বিপিন, বাঙ্গালী-ভরসা!
সাগর লঙ্ঘিতে পারি, গোষ্পদে ডুবিলে?
তবে চ ভারত মাটী! ইংরেজের(ই) জয়!"

চিরপরিচিত কামিনীকুমারের স্বর জানিতে পারিয়া বিপিনকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন ভাই কামিনী! আমার মস্তকের পীড়া হইয়াছিল বলিয়া ওরূপ করিয়াছিলাম। তুমি কিছু মনে করিও না। তাহার পর দুই বন্ধুতে ভারতের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিলেন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত হইল:—

"বাক্যে শুধু কালক্ষয়, কার্য্যহানি তায়।"
অতএব
কহিলা বিপিন, "আর বিলম্ব না সহে;
কল্যই সভায় সব করিব নিশ্চয়।
—ভারত উদ্ধার কিম্বা সভায় বিলয়।"

তাহার পর দুই জন বন্ধু দুই দিকে নিজ নিজ গৃহে গিয়া ভাত খাইয়া:—

"ভারত উদ্ধার প্রাতে ভাবিয়া শুইলা।

পর দিন বেলা চারি ঘটিকার সময় বিপিনকৃষ্ণ কামিনীকুমার প্রভৃতি পঞ্চ জন সভ্য এক জীর্ণ সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। আর

শর্মার অলৌকিক কবিত্বশক্তি সভাগৃহের যেরূপ বর্ণন করিয়াছে তাহা অতি মনোরম।

যদি নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান লাবক সভাগৃহের অনেক পরিমাণ অবস্থাগত ঐক্য না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতাম :—

"আজীর্ণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,
সোণাধরা বালি-চুন-শাদ স্থানে স্থানে
খসিয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখা যায়,—
শোভিছে সুরম্য ; রাজ-পথের উপরে,
আঁকা বাঁকা, উঁচু নীচু, কাষ্ঠ-দণ্ড-শ্রেণী-
আবৃত অলিন্দ তার ম্লানভাবে ঝুলি ;
নশ্বর জগৎ তাই প্রমাণিছে যেন।
অযুত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট
ক্ষয়িত কোথায়, আর স্খলিত কচিৎ।
উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ হাত,
প্রস্থে, অনুমানি, হ'বে হাত সাত আট ;
মাতুরিত মেজে, তার উপরে চেয়ার
সারি সারি সুসজ্জিত, পূর্ণ চতুষ্পদ,
ত্রিপদ দু চারি খান, মধ্যস্থ টেবিল
কালের করাল চিহ্ন দেখাইছে দেহে.
জীর্ণ, শীর্ণ, ছিন্ন রজ্জু আশ্রয় করিয়া,
বিলম্বিত টানা-পাখা, চীর-আবরিত ;
পড়িত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ
দড়ি আগে ছেঁড়ে, কিম্বা কড়ি আগে পড়ে।"

এইরূপ সভাগৃহে সভ্যগণ উপবিষ্ট হইলে রীতিমত সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। গত উপবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে বিপিনকৃষ্ণ সমবেত সভ্যগণের অনুমতি লইয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করি-লেন। বক্তৃতাটী এই:—

"ভদ্রগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীয়গণ,
যুষ্মদীয় অনুমতি সহকারে আমি
চাহি প্রস্তাবিতে এক গভীর প্রস্তাব;
জীবন মরণ সম যে প্রস্তাব গুরু;
যে প্রস্তাবে নির্ভরি'ছে সবার কল্যাণ;
দেহ প্রাণ নিজ হ'বে র'বে বা পরের
চির জন্ম, যে প্রস্তাবে খলু মীমাংসিবে,
ভারত আপন ভার, পারে কি না পারে
লইতে আপন স্কন্ধে, সিদ্ধ যে প্রস্তাবে,
যে প্রস্তাবে, সংক্ষেপতঃ নির্ভরে সকলে—
আমাদের, বাঙ্গালার ভারতের ভাবী।
* * * * কিন্তু দুঃখের বিষয়,
নহি বাক্যপটু আমি, নাহিক বাগ্মিতা,
নাহি শব্দে অধিকার প্রকাশিতে ভাব,
উদিত অন্তরে যত; * *
* * * * * *
ইংরাজের অত্যাচার নহে অবিদিত
কাহার এ সভাক্ষেত্রে; বিস্তার বিফল,
তথাপি, মরম দুঃখ চরম যাহাতে,
গন্তব্য উল্লেখ তার না করিয়া আজি
পারি না গ্রহিতে পুনঃ আসন আমার;
বিশাল ভারত-ক্ষেত্র, মাসাবধি যা'র
নিয়ত হাঁটিলে প্রান্ত দেখা নাহি যায়,
লৌহের শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গ বাঁধি,
চালাই'ছে তদুপরি আগ্নেয় শকট,
সপ্তাহের পথ হেন সঙ্কীর্ণ করেছে।
কি আর লাঘব বল, কোন্ অপমান
এর চেয়ে তীব্রতর বাজিবেক হৃদে?

হৃদয় থাকে হে যদি শোণিত তাহাতে
জমিয়া না থাকে যদি দধির মতন
—শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর যাহা দুগ্ধের বিকার!
এ নিগড় খুলিবে না, দুলিতে দেহের
দুই পার্শ্বে দুই ভুজ? * *
নিজ নিজ বাহু কাটি, সাগরের জলে
ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও; ঘৃণা যদি থাকে,
নিশোণিত বাহু যদি নাহি উন্মোচিতে
যেই শেল হানিয়াছে বাঙ্গালার বুকে,
চড়ায়েছে যেই শূলে প্রাচীন ভারতে!
—অসাধ্য বোঁচার আর না নিন্দিবে কেহ।
হায় ঘৃণা! হায় লজ্জা! হাধিক্! হাধিক্!
হা কষ্ট! হা দুরদৃষ্ট! ভাগ্য ভারতের!
চীৎকারিছে দিবানিশি কবি, নাট্যকার,
তবু না ভাঙ্গিল ঘুম, অকালকুষ্মাণ্ড
কুম্ভকর্ণ বা.. .ীর, ভারতের তরে!
বিলম্ব না সহে আর * * * *
বঙ্গের সুপুত্র যত পত্র-সম্পাদক,
কবি আর নাট্যকার, যে দিন লেখনী
ধরিয়াছে, সেই দিন হইতে তটস্থ
কম্পবান-কলেবর ইংরেজের কুল।
ভাব ত ধরিলে অস্ত্র এ হেন বাঙ্গালী,
কি হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গতি!—”

বিপিনকৃষ্ণের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সুরেশ নামক একজন সভ্য ভারতবর্ষীয়দিগের বলহীনতা ও ঐক্যহীনতানিবন্ধন ইংরাজদিগের ভারতে অবস্থিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এই প্রস্তাব করিলে সভাস্থ সকলেই সুরেশের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। একজন সভ্য সত্যই তাহাকে মারিতে যাইতেছিলেন এমন সময় সুরেশ বলিয়া উঠিলেন—

"এস না? কেমন—" অমনি সভাস্থ সকলেই নিস্তব্ধ হইলেন। ইহার পর বিপিনকৃষ্ণ আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন :—

"শেষ বক্তা বকিলেন বহু অপলাপ ;
উত্তর তাহার কিন্তু চাহি না দানিতে
উপস্থিত ক্ষেত্রে। তবে যাইতে যাইতে
দুই চারি কথা তা'র সম্বন্ধে বলিব।
শরীরের বলে নাহি দেখি প্রয়োজন,
বুদ্ধিবল থাকে যদি ; কৌশলে কামান
ভোঁতাইতে পারা যায়, গোলার অনল
কৌশলে বরফ-তুল্য শীতলিয়া যায়
সংখ্যার পদার্থ কিছু নাহি থাকে কভু,
পঞ্চজন আছি, শূন্যে হইব পঞ্চাশ,
পাঁচ শত, সহস্র বা শূন্যেতে সকল।
মূলেতে প্রধান রাশি একমাত্র যদি
থাকে, তবে শূন্য দিয়া লক্ষ করা যায়।
বৃথা শঙ্কা, শেষ বক্তা, না বুঝিয়া কেন
করিলেন ; যাহা হোক সত্বর যাহাতে
পরাজিত' ইংরেজে রণে, বিনা রক্তপাতে
আমাদের পক্ষে, হয় ভারত-উদ্ধার
উপায় তাহার অদ্য হোক বিবেচিত।"

কামিনীকুমার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন :—

"   *   *   পরাজয় যদি
স্বদেশ উদ্ধার হেতু, নাহি লাজ তায়।
ফাঁসি দিতে চাহে যদি বিজয়ী ইংরেজ,
লইব না গলে ফাঁসি ; কি ভয় হে তবে ?—
কয়াইতে পারে বলে মুখের ব্যাদান,
কিন্তু গলাইতে বস্তু নাই পারে কেহ।

উচ্চ ডাকি, নিদ্রাগত ভারত সন্তানে
জাগাও হে বঙ্গবাসী, জাগুক সকলে,
উঠ সবে মুখ ধোও, পর নিজ বেশ
ভারত উদ্ধারে মন করহ নিবেশ।”

তাহার পর কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ কার্য্যভার দিলে ভারতের উদ্ধার সাধন হইবে, তাহলে তাহা আলোচিত ও স্থিরীকৃত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।

চতুর্থ সর্গের শেষভাগে ও পঞ্চমসর্গে কি কি উপায়ে সভ্যেরা ভারতের উদ্ধার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। নৈতিক ফলে বিষময় হইলেও—তাহা কল্পনায় এত সুন্দর হইয়াছে যে সমস্তই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি পাঠকগণ আমাদিগের এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন:—

“না পড়িতে তোপ,
না ডাকিতে আস্তাবলে কুক্কুট কুক্কুটী,
ভারত-ভরসা যত বাঙ্গালীর চূড়া,
সভার মন্ত্রণা স্মরি’, নিন্দা পরিহরি’,
কোঁচান কাপড় কেহ করি’ পরিধান,
পরিয়া পিরাণ গায়’ কোঁচান উড়ুনী
বুকের উপরে বাঁধি’ ফুল উঁচু করি,
ইজের চাপ্‌কান কেহ কার্পেটের টুপি,
যাহার যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভারত-উদ্ধার-ব্রতে উৎসৃজিল তনু,
বাহিরিল গৃহ হৈতে। হায় রে সে সাজে
কন্দর্প ভুলিয়া যায়, অন্য কোন ছার!
ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দেশে চলিল সকলে।
সুন্দর বনেতে গেল তিন মহাবীর,
রমণী, মোহিনী আর কিশোরীমোহন।
কাটাইল বহুতর সুন্দরীর গাছ

সেই মহাবনস্থলে, উজাড়িল বন,
ক্রমেতে চালান দিল এ মহানগরে।
সেনানী উমেশ আর অপ্রকাশচন্দ্র
পাণ্ডুয়ার বনে গেল বাঁশ কাটাইতে;
দিনাজপুরের অন্ত ছাড়াইয়া তা'রা
রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ইত্তি আদি
কত দেশে কত বাঁশ করিয়া সংগ্রহ,
মহানগরীতে শেষে আনিল ফিরিয়া
বহুদিন পরে। হেথা উত্তর-পশ্চিমে
ছাতু আর লঙ্কা যত যেখানেতে মেলে
সমস্ত হইল ক্রীত। লঙ্কা কলিকাতা,
ছাতু সব পেশাওর মুখেতে চলিল।
আপনি বিপিনকৃষ্ণ ছাতুর সহিত।
বস্তা বস্তা ছাতু যায় কে করে গণন,
ভারতের প্রান্তে ক্রমে সব উপনীত।
সীমান্তে ইংরেজ যত, করিয়া সন্দেহ
বিপিনে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা, কি আছে বস্তায়
কোথা হইতে আইল, যাইবে বা কোথা?
বিপিন বলিল, "ছাতু খাইবার বস্তু,
বাণিজ্য উদ্দেশে যাবে আফগান দেশে।"
ইংরেজ না ভুলি তায় বলিল বিপিনে
পরীক্ষিতে হ'বে ইহা নতুবা ছাড়িয়া
দিবে না একটী বস্তা। তথাস্তু বলিয়া
নিয়ম করিয়া পরে একমাস কাল,
বিপিন চলিয়া গেল আফগানস্থানে।
সীমান্ত-রক্ষক ছিল নিষ্টর ভনশ,
সকল বস্তার ছাতু দেখিল খুলিয়া
এক এক করি, তা'র তথাপি সংশয়

না মিটিল। রাসায়ন-পরীক্ষার তরে
প্রধান নগরে যত প্রধান বিজ্ঞানী.
তাঁদের সমীপে দিল নমুনা প্রেরিয়া।
বহু পরীক্ষার পরে ক্রমশ সমীপে
সিদ্ধান্ত উত্তর গেল—দহমান নহে।
বিপিন ইত্যবসরে আমীরের সহ
স্থাপিল সাহায্য-সন্ধি, রক্ষণ পীড়ন।
নিয়ম হইল এই—আমীরের রাজ্যে
বিপিন পাইবে পথ বাঙ্গালীর তরে
অবারিত, হলে পরে ভারত উদ্ধার
ভারতের অর্দ্ধ অংশ আমীর পাইবে।
ঠিক এই মর্ম্মে সন্ধি পারস্যের সহ
বিপিন করিয়া শেষে, ভারত-সীমায়,
জাহাজ লইবারে ফিরে আইল, লইল।
আরবের মরুভূমি উত্তরিয়া পরে,
সুএজ-খালের ধারে অবুক্ত জাহাজ
ভাড়া করি, ছাড়ুনিয়া বোম্বাই করিল।
স্বদেশে বিপিনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল।
হেথা কলিকাতা ধারে মহাহুলস্থুল,
ইংরেজ অসন্দিহান কিন্তু বরাবর।
বাঙ্গাল কামার যত বঁটি নিরমাণে,
সুন্দরীর কাষ্ঠে বাঁট গড়িছে ছুতোর,
বাঁশ সব কাটিয়া গড়িছে পিচকারী।
চিত-পুর-খাল-ধারে কুম্ভকার দল
মাটী তুলিবার ছলে, সুরঙ্গ কাটিয়া
চালিল গড়ের মুখে। গড়ের তলায়,
সেই সুড়ঙ্গ অন্তরে লঙ্কা গুঁড়াকৃতি
বোঝিত হইল, চুপি চুপি নিশি যোগে।

কেহ না জানিল বার্ত্তা, না সুধায় কেহ।
বাজারে পটকা যত মিলিল কিনিতে,
সব কিনি, সঙ্কেতে তার ছিঁড়িয়া লইয়া,
পটকা লঙ্কার গুঁড়ে মিশাইয়া দিয়া,
রক্ষিত সন্তের সূত্র সুড়ঙ্গের মুখে!
দিবা নাই, রাত্রি নাই, এ ভাবে উদ্যোগ,
শেষ হইল একদিন কার্ত্তিক মাসেতে।
ইতি ভারতোদ্ধারকাব্যে উদ্যোগো নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

বাঙ্গালার বিভাবরী হইল প্রভাত।
আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙ্গালা,
সমীর বহিল যেন নূনবীন ভাবে,
ভাবি-আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিরের ছলে,
সর্ব্বাধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন।
কামিনী, বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, রমণী,
আর যত বঙ্গবীর, গত রজনীতে—
উৎসাহ আশঙ্কা, আশা নৈরাশ্য-পর্য্যায়ে
পীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন,—
উঠিয়াছে চমকিয়া রহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিয়াছে, তা'রা নিদ্রার বিলাস।
"দুস্বপ্ন, দুস্বপ্ন" বলি' প্রণয়িনী কুল
ধরিয়াছে তাহাদের বুক চাপি' চাপি'।
দুরু দুরু করে হিয়া প্রভাত যখন,
বিপিন বিশুষ্কমুখ উঠিলা বসিয়া

প্রণয়িনী-পদপ্রান্তে; ধরিয়া চরণ
"আজি রে সুন্দরি, দেখা জনমের মত
হয় বুঝি; আর বুঝি ও মুখ-কমল
হাসিবে না এ অভাগা মুখ পানে চা'হি';
জনমের মত বুঝি হাসি ফুরাইবে;
একমাত্র আমি জানি তুষিতে তোমায়,
কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ, যতন,
আমি যদি যাই, প্রিয়ে, প্রাণের পুতলী?"
কান্দিলা বিপিনকৃষ্ণ ঝর ঝর স্বরে।
"সে কি কথা প্রাণনাথ? একি কুলক্ষণ"
উঠিয়া বসিল সতী, পতি-কর ধরি,'
"কোথায় যাইবে তুমি? কেন হেন ভাব?
নিবার নয়ন-বারি, রোদন তোমার
কভু নাহি শোভা পায়; কি দুঃখে বা কাঁদ?
নাহিক চাকুরী, তাই যা'বে কি বিদেশে
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে?
কাজ কি তোমার গিয়া, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ! কাটনা কাটিয়া
খাওয়াইব ঘরে বসি' ভাবনা কি তার?
অবশ্যই কোনমতে দিন কেটে যাবে।"
"তা' নয় প্রেয়সী" বলে ঈষৎ হাসিয়া
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠে চিত্তের আবেগে,
—সে হাসি কান্নার সনে মিশিয়া সুন্দর,
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে হায় রে যেমতি
নববর্ষা-সমাগমে—"তা' নয় প্রেয়সি,
স্বদেশ উদ্ধার-তরে যাইতেছি আজি,
করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে,
শেষে পরাজিব তারে, সফল জনম

করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা-ধন,
যেদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা।"
"রক্ষা কর নাথ যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে"—চমকে বিপিন,
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ তা'র কাঁটা দিয়া উঠে—
"দেখ দেখি যার নাম করিতে স্মরণ
অস্থির হ'তেছে হেন, সহিবে কেমনে?
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে? তার মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে। বলি প্রাণনাথ,
দেশত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,
আমারেই দেও নাথ, ল'ব শিরঃ পাতি
আমি তব চিরদাসী।" ভয় নাই সতি,
স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্ম্ম তুমি,—দর্শন বিজ্ঞান
পড়া শুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায়।
তোমারে দিবার বস্তু নহে তা' কদাপি।
কৌশলের যুদ্ধে দেহে কভু না বাজিবে;
নিশ্চিত লাইব রণে, উদ্যম ভাঙ্গিয়া
হতাশ্বাস, হতবল করিও না মোরে।"
"ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন?
"প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়,
যাত্রাকালে নেত্র-জল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোন (ও) কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবারে হয়।"
"নিতান্তই যা'বে যদি প্রাণবল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,

(ফুকারি' কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
"আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।"—বিপিন সম্মত।
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে;

তাড়াতাড়ি স্নান করি' বঙ্গবীরবৃন্দ
নাকে মুখে গুঁজিলেন ভাতে ভাতে দুটো;
কাঁপিতে কাঁপিতে, হায় আশ্বিনে যেমতি
শারদীয় মহোৎসবে, অষ্টমী তিথিতে,
পূজার প্রাঙ্গণে পাঁঠা বদ্ধ যূপকাষ্ঠে
বিল্বপত্র চর্ব্বে, যবে ছেদক আসিতে
বিলম্ব করয়ে কিছু; অথবা যেমন
মার্গশীর্ষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
যাত্রা করি' এবে একে বীরশ্রেষ্ঠ যত
সভাগৃহে উপনীত হইলা সকলে।
আইল তাড়িত বার্ত্তা—'ফেলা হইয়াছে'—
বুঝিলা সে বীর-বৃন্দ নিরূপিত দিনে
পূর্ব্বের সঙ্কেত মত, সুএজে যে ছাতু
বিপিন আসিয়াছিল সঞ্চিত করিয়া,
তথাকার কর্ম্মচারী গাঢ় নিশিযোগে
সে সব নিক্ষেপিয়াছে, সুএজের খালে,
শুষিয়াছে যত জল, খাল বন্ধ এবে।
আনন্দে বিবম রোলে হৈল করতালি,
"জয় ভারতের জয়' শব্দ সভাতলে;—
ইংরাজের ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ এবে।

চলিলা সে যোদ্ধৃদল মহাতেজে ভরি।
উড়িতেছে দূর শূন্যে বংশ-দণ্ডোপরি,
রঞ্জিত বাসন্তি রঙ্গে, মদন মূরতি-
সুশোভিত, ভারতের নাম আঁকা তাহে,

পতাকার শ্রেণী, আহা পত পত স্বনে,
সঞ্চারি' অরাতি-হৃদে কালান্তের ভয়।
বাজিতেছে স্বর্ণ-বাদ্য তবলার চাটি,
(ভটিতে আবদ্ধ যাহা) মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সেতার, ফ্লুট, বীণ, ঘুঙ্গুরের সনে
সুমধুর ভীমরবে, রৌরব চৌদিকে।
প্রত্যেক যোদ্ধার করে ভীম পিচকারী,
কাহার বা বঁটি হাতে,—চলে বীরদাপে,
কাঁপাইয়া শত্রুহিয়া, কাঁপাইয়া মহী।
মুখে জয় জয় শব্দ, আকুলিত দেশ,
বিপিন, কামিনী চলে পশ্চাতে পশ্চাতে
সকলে উৎসাহপূর্ণ, হায় রে যেমতি
উর্দ্ধপুচ্ছ গাভিদল গোষ্ঠের সময়ে।

গড়ের সম্মুখে গিয়া বীরবৃন্দ এবে
দাঁড়াইলা ব্যূহ রচি', অপূর্ব্ব সে ব্যূহ,
চক্রাকৃতি চতুষ্কোণ, অর্দ্ধচন্দ্র প্রায়,
অদ্ভুত শ্রবণাকৃতি শ্রবণ অন্তরে,
করাল কাতার দিয়া দাঁড়াইলা সবে
পটকা এক এক হাতে। বিপিন আদেশে,
প্রসারি' দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যা'র,
সবলে নয়ন মুদি, মুখ ফিরাইয়া
পটকা ছুড়িল ভীম বজ্রনাদ করি'।
কলসে পটকা পুরি, সংযোজি অনল
নিক্ষেপিল মহাবেগে গড় অভিমুখে।

ভাবিয়া তামাসা কিছু হইছে বাহিরে,
ইংরেজ-সৈনিকদল, যত ছিল গড়ে
দৌড়াদৌড়ি বাহিরিল রঙ্গ দেখিবারে,
—হায় রে না জানে তা'রা অদৃষ্টের বশে,

কালের করাল রূপ হইয়াছে এবে।
সিকতা-মিশ্রিত জলে পুরি' পিচকারি
হানিল বাঙ্গালী-সৈন্য ইংরেজের আঁখি
লক্ষ্য করি', কচকচি কচালি নয়ন
বিষম বিভ্রাট ভবে জানিল ইংরেজ।
"জয় ভারতের জয়"—ঘোর জয়ধ্বনি
ছাইল বিমানমার্গ, হুড়াহুড়ি করি'
পলায় গড়ের মধ্যে ইংরেজের দল।
  পুনশ্চ ইংরেজ-সৈন্য বাহিরিল বেগে
সসজ্জ সশস্ত্র এবে; বন্দুক, শঙ্গিন,
ঝক ঝকি ঝলসিল বাঙ্গালী-নয়ন,
কোষের ভিতর হয় কিরিচ-ঝঞ্ঝনা
বাঙ্গালী-হৃদয়ে ভীতি উপজি' ক্ষণিক।
সেনাপতি আদেশেতে, অরাতির দল
করিল আওয়াজ ফাঁকা ধড় ধড় ধড়,—
বাঙ্গালী অর্দ্ধেক সৈন্য পড়ে মূর্চ্ছাগত।
তথাপি সে রণে ভঙ্গ না দিয়া বাঙ্গালী,
অর্দ্ধবল, আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ এবে।
সুড়ঙ্গের মুখে সল্‌তে ছিল সুরক্ষিত;
অনল সংযোগ তাহে হইল এখন,
চটপট ভীম শব্দে গড়ের ভিতর,
গড়ের বাহিরে তথা, যথায় ইংরেজ-
সৈন্যশ্রেণী দাঁড়াইয়া, ক্ষিতি বিদারিয়া
গর্জ্জিয়া উঠিল ধূম লঙ্কা-দগ্ধ করি';
ধূমে ধূমে সমাচ্ছন্ন হৈল দশদিক্,
প্রবল লঙ্কার ধূম প্রবেশি অরাতি-
নাসারন্ধ্রে, গলে, হায় খক খক খকে
কাসাইল শত্রুদলে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচে

ছাড়াইল ভয়ঙ্কর, কাতরিল সবে।
শুড়পরি বালি-জলে পড়ে পিচকারি।
কাতর ইংরেজ-কুল; খালিয়া পড়িল
হস্ত হৈতে ভূমিতলে সমস্ত বন্দুক।
কুড়াইয়া সে বন্দুক বাঙ্গালী সৈনিক
মহাবেগে গঙ্গাজলে নিক্ষেপিল এবে।
সুশিক্ষিতা অশিক্ষিতা বিবিধ রমণী—
কাহার চসমা চক্ষে গৌন পরা কেহ,
কার্পেট-শিল্পিনী কেহ বুনিছে সুন্দর,
মখমলে ঊর্ণা ফুল,—দাঁড়াইয়া ছাদে
এ উহারে দেখাইয়া বীর্য্য বাখানি'ছে,
কেহ বা হেরিয়া মুগ্ধ, দেখি'ছে নীরবে;
মোহন হাসির ছলে কোন সীমন্তিনী
পুষ্প বরিষণ করে বাঙ্গালী উপরে।
ধন্য রে বাঙ্গালী-শিক্ষা! ধন্য রে কৌশল
ধন্য রণ বাঙ্গালীর! ধন্য বীরপনা!
বিচিত্র সাহস তা'র কেমনে বাখানি।
স্তব্ধ দেব দৈত্য দেখি' বাঙ্গালী-বীরতা।
অস্ত্রহীন অরিকুল, ব্যাকুল ভাবিয়া,
পুনঃ প্রবেশিল সবে গড়ের অন্তরে,
করিলা মন্ত্রণা ঘোর অর্দ্ধদণ্ড কাল।
পুনঃ জয় জয় ধ্বনি উঠিল আকাশে,
"জয় ভারতের জয়," কাঁপিল ইংরেজ।
মাচায় অর্জ্জিয়াছিল অলাবুর লতা,
পতিপ্রাণা মেমকুল ব্যঞ্জনের তরে
সেই সব মাচা খুঁজি তন্ন তন্ন করি
অগণ্য অলাবু এবে করিল বাহির।
অলাবুর প্রহরণে সাজিয়া আবার

গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ।
ইংরেজ বাঙ্গালী পুনঃ আরম্ভিল রণ।
নির্ভীক বাঙ্গালী বীর বঁটি ধরি করে
কচ কচ লাউ কাটি করে খান খান।
অলাবু প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে,
অস্থির বাঙ্গালী সৈন্য তিতিবারে নারে,
পড়িল সৈনিক বহু।—দেখি মিত্রক্ষয়,
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গ-বিলাসিনী
নয়নে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
অরাতি-দমন লক্ষ্য; অসংখ্য ইংরেজ
পপাত সে ভূমিতলে মমারচ বহু,
রণে ভঙ্গ দিল যা'রা ছিল অবশেষ,
মাগিল জীবন ভিক্ষা বিনয়ে, কাতরে।
তথাপি উকীল-সৈন্য বটি হস্তে করি',
বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
পড়িল অরাতি মাঝে—পলায়নপর
আপনি যাহারা এবে; জয় জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক্, হারিল ইংরেজ।
শান্তির প্রস্তাব যবে করিল অরাতি,
উকীল সম্মতি দিল; হইল নিয়ম
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ যতেক
অনুমতি না লইয়া, থাকিবে ভারতে
ভৃত্যভাবে, ভারতের করিবেক সেবা।
—যে যেমন আছে এবে রহিবে তেমতি।
স্বাধীন বাঙ্গালা এবে, স্বাধীন ভারত,
ভারতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
বাঙ্গালী ভারত-প্রাণ হইল বিখ্যাত
ভারত-উদ্ধার যবে হৈল হেন মতে।

ভারত-উদ্ধার কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ রামদাস ভণে, শুনে পুণ্যবান্॥
ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে উদ্ধারো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।
সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে আমরা ভারতোদ্ধার কাব্যের প্রায় অর্দ্ধেক উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলাম। বাস্তবিকই কাব্যখানি কল্পনা-অংশে আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে যে আমরা এতখানি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কবি ইহাতে এই কয়েকটী বিশেষ গুণ দেখাইয়াছেন—অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা, কল্পনা, সৃষ্টি, উপমা, তীব্র বিদ্রূপ এবং গম্ভীর হাস্যরসের (Mock heroic.) অবতারণা। আর একটি ক্ষমতা এই যে ইনি পূর্ব্বকবিগণের ভাব—অধিক কি ভাষা পর্য্যন্তও—এমন নূতন আকারে গঠিত করিতে পারেন যে তাহা আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম :—

(আদর্শ) উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজবেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥
(নকল) উঠ সবে মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
ভারত উদ্ধারে মন করহ নিবেশ॥

আমরা বিশেষ বিশেষ স্থল উদ্ধৃত করিয়া উপরি উল্লিখিত প্রত্যেক গুণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রমাণ দিতে পারি। কিন্তু প্রস্তাববাহুল্য-ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। পাঠকেরা ইচ্ছা করেন ত এক এক খণ্ড কিনিয়া এই সকল গুণের অস্তিত্বের প্রমাণ লইতে পারেন।

উপসংহারকালে গ্রন্থ-পাঠের নৈতিক ফল সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস যে এই গ্রন্থ পাঠের অনিবার্য্য ফল স্বদেশানুরাগের অঙ্কুরে বিদলন। তাঁহারা বলেন যে স্বদেশানুরাগ ভারতে এখনও শব্দমাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে। এখনও ইহা লোকের হৃদয়ের সহিত—প্রতীতির সহিত—সংমিশ্রিত হয় নাই। সুতরাং এরূপ

তীব্রতর বিদ্রূপোক্তি ইহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। এই উক্তিতে যে যথেষ্ট সত্য নাই একথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। তরলমতি তরুণবয়স্ক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অন্তরে ধীরে ধীরে যে অল্প পরিমাণ স্বদেশানুরাগ প্রবেশ করিতেছিল, একপ কঠোর বিদ্রূপোক্তিতে তাহাদিগের অন্তর হইতে সেই কণামাত্র স্বদেশানুরাগ সম্ভবতঃ চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদিগের অন্তরে সেই স্বদেশানুরাগের ভাব জলদক্ষরে লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা একপ বিদ্রূপোক্তিতে ভগ্নহৃদয় না হইয়া বরং দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইবেন। কারণ এ বিদ্রূপোক্তির উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগের মূলে কুঠারাঘাত করা নহে, ইহাকে উত্তেজিত করা মাত্র। যে সকল স্বদেশানুরাগাভিমানী স্বদেশানুরাগকে শুদ্ধ বক্তৃতায় আবদ্ধ রাখিতে চান, যে সকল তরলমতি যুবক ভারতোদ্ধারব্রতের গুরুত্ব ও দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া হাস্যাস্পদ কল্পনাজালে আবদ্ধ হন, এই বিদ্রূপবাণ তাঁহাদিগের প্রতিই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা ব্রতের গুরুত্ব বুঝিয়া ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহেন, যাঁহারা ভারত-উদ্ধারকে নাম কিনিবার এবং অর্থ ও যশ অর্জ্জন করিবার পন্থাস্বরূপ মনে না করেন, যাঁহারা এই ব্রত উদ্‌যাপনে ধন, প্রাণ, মান, সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, এ বিদ্রূপোক্তি তাঁহাদিগের প্রতি বিক্ষিপ্ত নয়।*

---

* কলিকাতায় অনবস্থিতিকালে এই গ্রন্থের সমালোচনা করি। মফঃস্বলবাসিগণের মনে ইহাতে যে কুফল ফলিবে তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। দেশহিতৈষি দল মফঃস্বলে ভারত উদ্ধারের দল বলিয়া সর্ব্বদাই পরিহসিত হইয়া থাকেন। দেশহিতৈষণা যেন আজ কাল উন্মাদ বিজৃম্ভণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আমাদের বিবেচনায় ভারত-উদ্ধার ইহার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী।

গ্রন্থকার।

রাজভক্তি ও রাজোপহার।

স্নেহ অগ্রে নীচগামী হয়, পরে ভক্তি ঊর্দ্ধগামিনী হয়। বয়োবিদ্যাদি গুণে জ্যেষ্ঠ হইতে বয়োবিদ্যাদিগুণে কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ নীচগামী হইলে, বয়োবিদ্যাদিগুণে কনিষ্ঠ হইতে বয়োবিদ্যাদিগুণে জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি ঊর্দ্ধগামিনী হয়। সহজ কথায়—তুমি আমায় ভাল বাস ত আমি তোমায় ভক্তি করিব। ভক্তি কৃতজ্ঞতার ফল। আমরা পিতা মাতাকে ভক্তি করি; অন্যান্য গুরুজনকে ভক্তি করিয়া থাকি, ইহার কারণ কি? আমাদিগের মতে কৃতজ্ঞতা। আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি দেখি যে জননী আমাদিগের ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে নিজের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল আমার শুশ্রূষায় রত আছেন। তাঁহার নিদ্রা নাই—বিশ্রাম নাই। দেখি পিতা—আমাদিগের ভরণ পোষণের জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রাণবিসর্জ্জনেও অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। দেখি অন্যান্য গুরুজনও তাঁহাদিগের সেই সব নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের অনুগামী হইতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদিগের মন সেই শৈশবেই কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়! সেই শৈশবে ভক্তি অতর্কিতভাবে আমাদিগের হৃদয়রাজ্য অধিকার করে। আমাদিগের বিশ্লেষণশক্তি পরিপুষ্ট না হওয়ায় তখন আমরা বুঝিতে পারি না যে ইহার কারণ কি। কিন্তু ভক্তি যেরূপ কৃতজ্ঞতার ফল—স্নেহ সব সময়ে সেরূপ নহে। জনক জননী বা অন্য গুরুজনদিগের মন যে সদা প্রসূত শিশুর প্রতি স্বতঃ স্নেহার্দ্র হয়—তাহাতে শিশুকৃত কোন প্রীতিকর কার্য্যের প্রাগ্‌ভাব নাই। সুতরাং তাহা কৃতজ্ঞতার ফল হইতে পারে না। সেইরূপ প্রজার প্রতি যে রাজার স্নেহ, তাহাতেও প্রজাকৃত কোন রাজানুরঞ্জনের প্রাগ্‌ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু রাজার প্রতি যে প্রজাদিগের ভক্তি তাহাতে রাজকৃত প্রজানুরঞ্জনের প্রাগ্‌ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বলপ্রয়োগ বা ভয়প্রদর্শনে ভক্তি জন্মিতে পারে না—কৃত্রিম ভক্তির বাহ্য প্রদর্শন মাত্র হইতে পারে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ না করিলে তিনি আমাদিগকে নরকে প্রক্ষেপ করিবেন—তিনি আমাদিগকে মুক্ত করিবেন না—ইত্যাদি ভয় প্রদর্শন দ্বারা যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিষ্কৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। ঈশ্বর তাঁহার প্রতি ভক্তি না করিলে আমাদিগকে নরকে প্রক্ষেপ করিবেন—আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন না—ইত্যাদি জানিতে পারিলে আমরা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারি—কিন্তু ভক্তি করিতে পারি না। ভক্তি স্বতন্ত্র, ভক্তিপ্রদর্শন স্বতন্ত্র। ভয়েতে ভক্তিপ্রদর্শন হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি জন্মিতে পারে না। বলপ্রয়োগ বা ভয়-প্রদর্শনের সহিত ভক্তির সামঞ্জস্য হইতে পারে না। যে সকল পিতা মাতা পুত্র কন্যাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ভক্তি নিষ্কৃষ্ট করিতে যান, তাঁহারা হয়ত প্রায়ই অভীপ্সিত বিষয়ে অকৃত-কার্য্য হন। প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ প্রায় একই-জাতীয় হৃদ্‌বৃত্তি। কেবল আধারাধেয়ের বিভিন্নতা হেতু ইহাদিগের কার্য্য স্বতন্ত্র—সুতরাং নামও স্বতন্ত্র। ইংরাজীতে এই তিন বৃত্তিই অনেক সময় এক "লভ্‌" (Love.) অর্থাৎ প্রেম শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। আমরা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, জনক জননীর প্রতি প্রেম, পুত্র কন্যার প্রতি প্রেম, এবং স্ত্রীর প্রতিও প্রেম করিয়া থাকি। এই শেষোক্ত প্রেমকে আমরা সচরাচর প্রণয় শব্দে অভিহিত করি। এই প্রেম বা প্রণয়কে যেমন আমরা বলপ্রয়োগে বা ভয়প্রদর্শনে জন্মিতে দেখি না, সেইরূপ ভক্তি ও স্নেহরূপ প্রেমকেও আমরা বলপ্রয়োগে বা ভয়প্রদর্শনে জন্মিতে দেখি না। নিঃশঙ্ক স্বাধীন ভাব—প্রণয়, স্নেহ ও ভক্তিরূপ প্রেমের উৎপত্তির অনিবার্য্য আনুষঙ্গিক। যেখানে নিঃশঙ্ক ভাব নাই, যেখানে স্বাধীনতা নাই,—সেখানে কখন স্নেহ, ভক্তি ও প্রণয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না। ঈশ্বর যদি প্রতিহিংসা-পরবশ হন, তিনি যদি আমাদিগকে সতত দণ্ডপ্রদানে উদ্যত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা ভয় করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার প্রতি আমাদিগের আন্তরিক ভক্তি জন্মিতে পারে

রামচন্দ্রের এরূপ অমানুষ চরিত্র যে শুদ্ধ আপতিক অর্থাৎ অবস্থার ফল এমন বোধ হয় না। এরূপ চরিত্র যে হিন্দুরাজগণের শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা রাজাদিগের জন্য যে সকল বিধির ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়াছেন,* হিন্দু রাজগণের অনেকেই যে অবিচলিত ভক্তির সহিত সে সকলের অনুবর্ত্তন করিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রায় সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যদি কখন এই প্রস্তাব স্বতন্ত্রগ্রন্থাকারে পরিণত করি, তাহা হইলে সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য হইতে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ তুলিয়া পাঠকবর্গের চিত্ত বিনোদন করিব। প্রস্তাব-বাহুল্য ভয়ে আমরা এখানে শুদ্ধ কালিদাসের কাব্য হইতেই কয়েকটী উদাহরণ তুলিলাম। আশা করি আপাততঃ ইহাতেই পাঠকগণের পরিতৃপ্তি হইবে।

* রাজধর্ম্ম-বিষয়ক প্রস্তাবে মনু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু॥" ৭।৮০।

রাজা রাজ্যমধ্যে প্রজাদিগের নিকট হইতে সাম্বৎসরিক কর গ্রহণ করিবেন, এবং শাস্ত্রানুসারেই ঐ কর গ্রহণ করিবেন—এবং স্বরাজ্যস্থিত প্রজাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন।

"শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥" ৭।১১২।

যদ্রূপ প্রাণির আহার ব্যতিরেকে প্রাণ ক্ষীণ হয়, তদ্রূপ রাষ্ট্র-পীড়ন প্রভৃতি কোপাদি-দোষে রাজার প্রাণ বিনষ্ট হয়; অর্থাৎ রাজা রাষ্ট্রস্থ ব্যক্তিকে প্রাণতুল্য দেখিবেন।

"ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্ম্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দ্দিষ্ট-ফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে॥" ৭।১৪৪।

রাজার অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রজা পালন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে রাজা নিয়মিত কর গ্রহণ করেন তিনি অনন্ত ধর্ম্মের আধার হয়েন।

বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় লিখিয়াছেনঃ—রাজ্ঞঃ প্রজাপালনম্পরমো ধর্ম্মঃ।
প্রজাপালন রাজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বালিমগ্রহীৎ ;
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥"

রঘুবংশম্।

যেমন রবি সহস্র গুণ জল বর্ষণ করিবেন বলিয়া পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করেন, সেইরূপ প্রজাদিগেরই মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন।

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥" রঘুবংশম্।

প্রজাদিগের শিক্ষাবিধান, রক্ষণ ও পালনাদি দ্বারা তিনিই তাহাদিগের পিতা ছিলেন, তাহাদিগের পিতৃগণ কেবল জন্মদাতা মাত্র ছিলেন।

"দ্বেষ্যোঽপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধম্ ;
ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা ॥"

যেমন ঔষধ তিক্ত হইলেও পীড়িত ব্যক্তির নিকট তাহা আদরণীয়, সেইরূপ শিষ্ট ব্যক্তি শত্রু হইলেও তাঁহার আদরের পাত্র ছিল। আবার যেমন সর্পদষ্ট অঙ্গুলি প্রিয় হইলেও পরিত্যাজ্য সেইরূপ আত্মীয় ব্যক্তিও অশিষ্ট হইলে তাঁহার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ছিল।

কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস দিলীপের চরিত্রবর্ণনায় এই সকল গুণাবলীর সন্নিবেশ করিয়াছেন।

"স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্ব্বস্বদক্ষিণম্।
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব ॥"

রঘুবংশম্।

যে যজ্ঞে সৎপাত্রে যথাসর্ব্বস্ব দানরূপ দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়, তিনি বিশ্বজিৎ নামে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। মেঘ যেমন জলবর্ষণের নিমিত্তই বাষ্প গ্রহণ করে, সেইরূপ সাধু ব্যক্তিরা দান করিবার নিমিত্তই অর্থগ্রহণ করিয়া থাকেন।

কালিদাস রঘুর গুণবর্ণনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। আবার ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতী-সহচারিণী সুনন্দার মুখে স্বয়ম্বরে সমাগত রাজন্যবর্গের পরিচয়স্থলে মগধ রাজাকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন :—

যে দেশে পূর্ণ সত্য বলিবার অধিকার নাই—যে দেশে মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতে গেলে রাজদ্রোহিতা অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে হয়—সে দেশে রাজনীতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট কবিতা প্রসূত হইতে পারে না। যুবরাজ-সাহিত্য † তাহার নিদর্শন। ইহার কোন খানিই প্রশংসার যোগ্য নহে—কোন খানিতেই কবিত্ববিষয়িণী অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শিত হয় নাই। সকল গুলিই যেন শ্রম-প্রসূত। সকল গুলিই যেন অনুরোধে লেখা—সকল গুলিই যেন লিখিতে হয় বলিয়া লেখা। কোন খানিই অনিবার্য্য ভক্তি ও প্রীতির স্রোতে উচ্ছলিত হয় নাই। সকল গুলিতেই গভীর দুঃখাবেগ, ও বলবতী ভাবী আশা পরিব্যক্ত হইয়াছে। দুঃখ-শান্তি বা আশা-পরিতৃপ্তির চিহ্ন কোন খানিতেই দৃষ্ট হইল না। দুঃখ এই বলিয়া যে দুঃখিনী জননী ভারতভূমির দুঃখ কোন বিদেশীয় রাজার দ্বারাই অপনীত হইল না; আশা এই বলিয়া যে যুবরাজ আলবর্ট সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জননী ভারতভূমির সেই দুঃখ দূর করিবেন।

যাহা হউক এই উপলক্ষে যে কয় খানি কবিতাগ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে হেম বাবুর ভারতভিক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হেম বাবুর তেজস্বিনী কবিত্ব-শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে ইহাতেও পরিব্যক্ত হইয়াছে। শব্দ গুলি যেন স্রোতের জলের ন্যায় টল্ টল্ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার পূর্ণ কোরস গুলি যেন পাঠকগণের মনকে পূর্ণ আনন্দে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। ভারতভিক্ষার স্থানে স্থানে অতি চমৎকার সোৎপ্রাসোক্তি পরিদৃশ্যমান হয়। আমরা ইহার দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের পরিতৃপ্তি বিধান করিব।

আরম্ভ।

চারিদিক্ যুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
অর্দ্ধ ভূমণ্ডল করি তোলপাড়
ভারত-ভূমে পড়িল সাড়া—

---

† প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের আগমন উপলক্ষে যে কাব্য রচিত হইয়াছে।

"কোথা নৃপকুল, নবাব, আমীর,
রাজ-দরবারে হও হে হাজির,
করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা,
ছাড়ি সাঁচ্চা জুতা চুণী পান্না গাঁথা
বিলাতি বুটেতে পদ সাজাও।
"জানু পাতি ভূমে হেলায়ে উষ্ণীষ,
পরশি সম্ভ্রমে কুমার বৃটিশ,
বরাভয়প্রদ চারু করতল
তুলিয়া তুণ্ডেতে হইয়া বিহ্বল
অধর অগ্রেতে ধীরে ছোঁয়াও।
"ভবে মোক্ষফল রাজ-দরশন,
ভারতে দেবতা নূতন এখন,
সেই দেবজাতি-মহিষীনন্দন-
দরশনে পূর্ব্বপাপ ঘুচাও।
"কোথা কাশীরাজ, কোথা হে সিন্ধিয়া ?
কোথা হোলকার, রাণী ভোপালিয়া ?
মালী উদিপুর, যোধমহীপাল ?
ঝিন্দ ত্রিবঙ্কুর, শিক পাতিয়াল ?
মহম্মদি রাজা কোথা হে নিজাম ?
কোথা বিকানির ? কোথা বা হে জাম্ ?
ধোলপুর রাণা, জাঠের রাও ?
"পর শীঘ্র পর চারু পরিচ্ছদ,
অর্ঘ্যেতে সাজাবে আজি রাজপদ;
কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়,
'ভারত-নক্ষত্র' বাঁধিয়া গলায়,
রাজধানী মুখে ধাবিত হও।
"ঘোটকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে,
কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে,

ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে,
ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও
কর বাজভেট নবাব, আমীর,
রাজদরবারে হও হে হাজির —
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
করি তোলপাড় নগর পাহাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।

(শাখা।)

মেদিনী উজাড়ি ছুটিল উল্লাসে
রাজেন্দ্র-কেশরী যত,
পারিষদ বেশে দাঁড়াইতে পাশে,
শিরঃগ্রীবা করি নত ;
কেথরে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান
আফগানস্থান ছাড়ি,
ছুটিল কাশ্মীরি ক্ষত্রিয় ভূপতি
হিমালয়ে দিয়া পাড়ি ,
দ্রাবিড়ি, কঙ্কণ, ভোট, মালোবার,
মহারাষ্ট্র, মহীসুর,
কলিঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, মগধ,
অযোধ্যা, হস্তিনাপুর,
বুঁদেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থল,
কচ্ছ, কোঠা, সিন্ধুদেশ,
চাম্বা, কাতিয়ার, ইন্দোর, বিঠোর,
অরবলিগিরিশেষ,
ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে,
রাজধানী দিকে ধায়,
পালে পালে পালে পতঙ্গের মত

নিরখি দীপশোভায়,
ছুটিল অশ্বেতে রাজপুত্রগণ
চন্দ্রসূর্য্যবংশবীর ;
জলধি বন্দর হিমাদ্রি ভূধর
দাপটে হয় অস্থির।--
কোথা বা পাণ্ডব কৈলা রাজসূয়
দ্বাপরে হস্তিনামাঝে।
রাজসূয় যজ্ঞ দেখ একবার
কলিতে করে ইংরাজে !

আরম্ভ।

উঠ না উঠ মা ভারত-জননী
মহিষীনন্দন কোলেতে এল,
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল।
আদরে লয় না কুমারে সম্ভাষি,
আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারি মুখে,
বহু দিন হারা হয়েছ আপন
তনয়ে না পাও ধরিতে বুকে।
ত্যজ শয্যা, মাতঃ অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননি
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চির দুখী তুমি চির-পরাধীনা,
পরের পালিত আশ্রিতা সদা,
তুমি মা অভাগী অনাথা, দুর্ব্বলা,
ভজন-পূজন-যোগমুগধা !

মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে
জগতে এখনও আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব দুঃখ ঘুচাইতে
আপন তনয়ে বিদায় দিয়ে;
দেখাও, জননি, ধরিলা গো যত,
রিপুপদচিহ্ন ললাট-ভাগে,
দেখাও, চিরিয়া ক্ষতবক্ষস্থল
দিবানিশি সেথা কি শোক জাগে।
উঠ মা উঠ না ভারত-জননি,
প্রসন্ন বদনে বারেক ফের;
মহিষীনন্দনে কোলেতে করিয়া
প্রাতে শুক্রতারা উদিল হের!

(শাখা।)

ত্যজি শয্যাতল, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
গভীর পাণ্ডুর বদনমণ্ডল
আলোকে প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল,
কহিল উচ্ছ্বাসে ভারতমাতা—
"কেন রে এখানে আসিছে কুমার?
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার!
কি দেখিবে আর—আছে কি সে দিন?
ভ্রূভঙ্গি করিয়া ছুটিত যে দিন
ভারত সন্তান নৈঋত ঈশান,
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাহিত গাথা!
"ভারত কিরণে জগতে কিরণ,

ভারত জীবনে জগত-জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র আলোচন,
আছিল যখন ষড় দরশন—
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে,
ফিনিক, মিসরীয়, যূনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।
"ছিল যবে পরা কিরীট, কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
জ্বলন্ত অনল সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশি,
ডাকিত যখন 'জননী' বলিয়া
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া,
ছিলাম তখন জগত-মাতা!
"পাব কি দেখিতে তেমতি আবার
ক্রোড়েতে বসিয়া হাসিবে আমার,
ডাকিবে কুমার 'জননী' বলিয়া
ইউরোপ, আমেরিক উচ্ছ্বাসে পূরিয়া,
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতা!
"পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরীশেরও দেখি জীবনসঞ্চার!
আমি কি একাই পড়িয়া রব?
"কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল্ অরে বিধি বল্ রে আমায়?

চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হব।
"হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী!
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
চূর্ণ কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্য-শালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।
"মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার দুর্গ, নিকেতন,
রাখিল মহীতে—কলঙ্ক মণ্ডিত
কাশী, গয়াক্ষেত্র, চণ্ডাল-ঘৃণিত,
শরীরে কালিমা—দীনতা প্রতিমা
ধরণীর অঙ্গে যেন গাথিল!
"হায়, পানিপথ, দারুণ প্রান্তর
কেন ভাগ্য সনে হলি নে অন্তর?
কেন রে, চিতোর, তোর সুখনিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি কেন রে রহিলি?
জাগাতে ঘৃণিত ভারত নাম?
নিবেছে দেউটি বারাণসি তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ?
পূর্ব্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ
অরে অগ্রবন? সরযূ পাতকী,

রাহুগ্রাস চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে রাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?
"নাহি কি সলিল হে যমুনে, গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক-রাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে ?
"হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল তলে ?"

(তৃতীয়।)

আরম্ভ।

"এলো কি নিকটে,—এলো কি কুমার ?"
বলিল ভারতজননী আবার,
"কই কোথা, বৎস, আয় কোলে আয়,
পরশি বারেক শীতল কর।
"ডাক্ একবার, ডাকিস যে ভাবে
আপনার মারে—ঘুচা সে অভাবে
শত বর্ষে যাহা নহিল পূরণ,
(ভারতের চির আশা আকিঞ্চন)
ভুলিয়া বারেক বৃটিশ গর্জ্জন,
ভারতসন্তানে ক্রোড়েতে ধর।
"কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর,
নহে তুচ্ছ কীট—এদেরও অন্তর

দয়া মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,
মান অভিমান, জ্ঞান, ভক্তিময়—
এদেরও শরীরে শিরায় শিরায়
বহে রক্তস্রোত,—বাসনা-তৃষায়,
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে।
"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।
"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগত্‌ব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে;
সমর হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশমণ্ডল—
তখনও তাহারা ঘৃণিত নহে!
"যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন;
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্ত্যে
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,
তখনও তাহারা ঘৃণিত নহে!

"তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন অযোগ্য নহে।
"হে কুমার মনে রেখো এই কথা—
যে ভারতে তুমি জন্মেছ হেথা
পবিত্র সে দেশ—পূত-কলেবর
কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কোটি কোটি প্রাণী ঋষি পুণ্যধর,
কবি কোটি কোটি মধুর-অন্তর,
রয়েছে তাহার নিশ্বাসে রহে;
"শুন হে রাজন্ বনের বিহঙ্গ,
পুষিলে তাহার যতনের সঙ্গ,
পিঞ্জরে থাকিয়া সেহ সুখ পায়।
প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায়!
বনের মাতঙ্গ যতনে বশ!
"কোকিলের স্বরে জগত তুষ্ট;
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট?
কি ধন সে কোকিলে দেয়?
কি ধন বল বা বায়সে নেয়?
একে মিষ্টভাষা হৃদয় সরল,
অন্যে তীব্রস্বর পরাণে গরল,—
ধরা চায় সরল হৃদয়রস।
"আমি, বৎস! তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,
ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,

শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।
কি কব, কুমার, হৃদি বক্ষ ফাটে,
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে·
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে!—
"ব্রিটিশ-সিংহের বিকট বদন
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
"কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিবা ভেকধারী,
সম্রাট্ ভাবিয়া পূজি সবারে!
"এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,
নয়নের জল মুছা রে আমার
ভারত-সন্তানে লয়ে একবার
ভাই বলি ডাক্, হৃদি জুড়াও!

যুবরাজ সাহিত্যের মধ্যে দ্বিতীয় উল্লেখ-যোগ্য কবিতাগ্রন্থ নবীন বাবুর ভারত-উচ্ছ্বাস। এখানি অবকাশরঞ্জিনী ও পলাশী যুদ্ধের রচয়িতার সম্পূর্ণ অযোগ্য। নবীন বাবুর অমৃত-নিঃস্যন্দিনী লেখনী হইতে যে এরূপ অসার কবিতা গ্রন্থ প্রসূত হইবে তাহা আমরা কখন মনেও ভাবি নাই। বোধ হয় রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তি এ উপলক্ষে সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় তাঁহা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া নবীন যশঃ কলঙ্কিত করা উচিত ছিল না। যাহা হইক তথাপি ইহার স্থানে স্থানে নবীন বাবুর স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যে কয়েক কবিতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১৮)

"ছিল অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ যার,
আজি পরহস্তে আত্মরক্ষা তার;

অক্ষয় আছিল যার অস্ত্রাগার,
আজি অশ্রুরাশি মহাস্ত্র তাহার!
মহাকাব্য 'মহাভারত' যাহার,
মহা রঙ্গভূমি 'কুরুক্ষেত্র' তায়!
ভীষ্ম দ্রোণার্জ্জুন অধিনেতৃ যার,
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?

(১৯)

যাও যুবরাজ! রাজপুতানায়,
বীর ইতিহাসে পরিপূর্ণ যার
প্রতিপদ; যার প্রতিপদ হায়!
কীর্ত্তিস্তম্ভ কাল-সাগর-বেলায়।
এখনো 'চিতোরে' স্মৃতির নয়নে,
দেখিবে 'পদ্মিনী' চিতার অনল;
সেই স্মৃতি তব দয়ার্দ্র নয়নে,
আনিবে কি আহা! এক বিন্দু জল?

(২০)

"এ মহাশ্মশানে দাঁড়ায়ে কুমার,
জিজ্ঞাসিবে যবে—'এই রাজস্থান?'
উপহাসচ্ছলে অদৃষ্ট দুর্ব্বার,
করিবে উত্তর—'এই রাজস্থান!'
যাও, যুবরাজ, নর্ম্মদার কূলে,
ক'বে স্রোতস্বতী কল কল স্বনে,
পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র বীরাঙ্গনা কুলে,
সম্মুখ সমরে মরিত কেমনে।

(২১)

মহারাষ্ট্রজাতি,—নিদ্রাতেও যার
শিয়রে তুরঙ্গ কটিবন্ধে অসি;

হ'লো অস্তমিত বিক্রমে যাহার,
মোগলের বিশ্বত্রাস 'অৰ্দ্ধ-শশী।'
'শেষ পাণিপথে' 'এসাই' সমরে
স্বাধীনতা তরে মত্ত সিংহপ্রায়
যুঝিল যে জাতি প্রাণপন করে,
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?

(২২)

"একপদ আর;—সম্মুখে 'পঞ্জাব'
বীর-প্রসবিনী, 'শিখের জননী;
'চিলেনোয়ালায়' যাহার প্রভাব,
দেখিলা ব্রিটিশকেশরী আপনি।
'সিপাহি বিদ্রোহে' ভারতকলঙ্ক
প্রক্ষালিল যাবা শোণিত ধারায়,
শেই 'সিখ' জাতি—বীরের আতঙ্ক!
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?

(২৩)

"আজি সে জাতির ভস্মরাশি হায়!
সিন্ধু জাহ্নবীর নর্ম্মদার তীরে,
পড়ে আছে; ক্রমে বিধির ইচ্ছায়
হইবে বিলীন, কালসিন্ধুনীরে।
আজি ভস্মময় ভারত হৃদয়,
একটী ধমনী নাহি চলে তার

* * * *

উপসংহারকালে আমরা নবীন বাবুর নিকট নিম্ন-লিখিত শ্লোকের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করি:—

'সিপাহি বিদ্রোহে ভারত-কলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত-ধারায়'

যুবরাজ সাহিত্যের মধ্যে তৃতীয় উল্লেখ-যোগ্য কাব্য বাবু হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী-প্রণীত **ভারতে সুখ**। এ খানির বিশেষ গুণ পদলালিত্য। এই নব কবি জয়দেবের পদলালিত্যের অনুকরণে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কৃত কার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু চিন্তার গাঢ়তা, হৃদয়ভাবের গভীরতা, বর্ণনার ওজস্বিতা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে উচ্চশ্রেণীর কবি হওয়া যায় ইঁহাতে সে সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাইলাম না। আশা করি নব কবি ভবিষ্যতে কবিতা লিখিবার সময় শুদ্ধ পদলালিত্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া হৃদয়কে গভীরভাবে উচ্ছলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। যাহা হউক ইঁহার "ভারতে সুখ" পূর্ব্বোক্ত দোষ গুলি সত্ত্বেও যে এক খানি সুললিত কাব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা হইতে আমরা অনেকটী কবিতা না তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

৫

কেন দুঃখময় ভারত-ভবনে
কেন শুনি আজি আনন্দের ধ্বনি?
কেন চারি দিকে কোমল নিক্বণে,
মধুর সঙ্গীতে পূরিছে অবনী?—
অকালে কি আজি জগৎ-জননী
আবির্ভূতা উমা ভারত-মন্দিরে;
তাই কি ভারত প্রফুল্ল-বদনী,
নিরখি সুখদা ভব-তারিণীরে?

৬

শারদ পার্ব্বণে শুধু সুখ-নীরে
ভাসে অনিবার ভারত-দুখিনী,
মনের বেদনা ভুলিয়া অচিরে,
তিন দিন তরে হয় আহ্লাদিনী;
যেই তিন দিন ঝলে সৌদামিনী
অন্ধকারময় ভারত-অম্বরে,

জলে তিন দিন তিন খানি মণি
চির কারাগার ভারত ভিতরে

৮

এতদিনে কি রে চির দুখিনীর
হ'ল অবসান অনন্ত যাতনা!
শুকাল ঝরিত নয়নের নীর!
হাসিল মলিন বদন-চন্দ্রমা!
অয়ি অনাথিনি, মলিন-বসনা,
পাষাণে আবৃত তোমার কপাল,
এ জনমে আর কখন যাবে না
সেই শৈলখণ্ড রবে চিরকাল।

৯

চল লো কল্পনে! কাজ নাই আর
বর্ণি ভারতের দুঃখের কাহিনী;
কি হবে বর্ণিয়ে, চিত্তে অভাগার
উছলিবে সুধু দুঃখ-প্রবাহিনী;
মরিলে তনয় পুত্র-বিয়োগিনী
বরষি জননী নয়ন আসার,
কালের অন্তরে সেই অভাগিনী
পারে কি করিতে কারুণ্য-সঞ্চার?

১৫

"অই দেখ, আঁখি করি উন্মীলিত
চঞ্চল ফেনিল অনন্ত সাগর,
নীলমণি দিয়ে করেছি সজ্জিত,
তুষিতে তোমার কোমল অন্তর;
নীরময়-পথে, তুমি সহোদর,
আসিবে বলিয়া, আকাশ হইতে

আহরণ করি নীলমণিস্তর,
সাজায় পয়োধি প্রফুল্লিত চিতে।

১৮

"অই শুন অই শ্যাম কুঞ্জবনে,
মত্তা কোকিলার মুখে মুখ দিয়া;
ললিত পঞ্চমে মধু বরিষণে
ঝঙ্কারে কোকিল বসন্ত হেরিয়া;
সরস বসন্তে উল্লাসে মাতিয়া
নব কোকনদে ভ্রমর গুঞ্জরে;
পরিমল-ভারে অচল হইয়া
দক্ষিণ-অনিল মন্থরে সঞ্চারে।

২২

"বিমল স্ফাটিক আলোক-আধার
ঝুলিছে মার্জ্জিত রজত-শৃঙ্খলে,
ঝরে রাজপথে আলোক-আসার,
শত কোটি মণি কিরণ বিজলে;
কুসুমের দাম পূর্ণ পরিমলে
গ্রন্থিত প্রাচীরে লতায় লতায়,
কুসুমের দাম শতেক শৃঙ্খলে
বিনান জড়ান অতুল শোভায়।

২৪

দুরদৃষ্ট হায়! কর দরশন,
দেখ মা ভারত-সন্তান তোমার
অসার বিলাস করিতে সাধন,
উছলে সবার সুখ-পারাবার,
কিন্তু মা তোমার নয়ন-নীহার,
সজল প্রতিমা দেখে মা নয়নে;

সম্মানের তরে করি হাহাকার
লুটায় কেবল অন্যের চরণে।

যুবরাজ সাহিত্যের মধ্যে চতুর্থ উল্লেখ-যোগ্য কাব্য, সুপ্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ভাবী পতি রাজোন্নতি-নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্‌স অফ ওয়েল্‌স বাহাদুরের প্রতি ভারত-ভূমির অভ্যর্থনা'। যে কবি পদ্মিনীর উপাখ্যান লিখিয়াছেন, তিনি ভারতবাসী মাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যদি এখন হইতে তাঁহার কবিতা গুলিকে এরূপ জঘন্য রসাভাসে পরিপূরিত করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সেই জাতীয় শ্রদ্ধা হইতে অচিরাৎ বঞ্চিত হইবেন। সত্য তিনি রাজকর্ম্মচারী, সুতরাং রাজস্তোত্র তাঁহার অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য। তাই বলিয়া কি বৃদ্ধা জননী ভারতভূমিকে যুবতীর সাজ সাজাইয়া যুবরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়? তাই বলিয়া কি বৃদ্ধা জননীর মুখ হইতে——

"জরাজীর্ণ বটি আমি তোমায় নিরখি স্বামী,
পুনরায় পাইলাম নবীন যৌবন।

—এরূপ লজ্জাকর কথা বাহির করিতে হয়?

"কে বলে ভারতভূমি বয়সে জরতী।
অপ্সরা-আকারা নিত্য নবীন যুবতী॥"

—জননীর পরিচয় স্থলে তাঁহার আর কি কিছু বলিবার ছিল না? যাহা হউক রঙ্গলাল বাবুর প্রতি আমাদিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে; সুতরাং তাঁহাকে আমরা অনুরোধ করি তিনি যেন ভবিষ্যতে এরূপ জঘন্য কবিতা লিখিয়া আমাদের মনে ঘৃণার উৎপাদন না করেন।

যুবরাজ-সাহিত্যের মধ্যে পঞ্চম উল্লেখ-যোগ্য কাব্য বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "প্রিন্‌স ইন্‌ ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ ভারতে যুবরাজ। আমরা ইহার ইংরাজী নামকরণ দেখিয়াই চটিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নহে। ইহার প্রধান দোষ

ার মিলপ্রণালী বা রাইমিং *। যেমন করে হউক ইহার কবিতা দর শেষ অক্ষরের মিল ঘটান হইয়াছে। দুই একটী উদাহরণ লই পাঠকগণ আমাদিগের কথার অর্থ বুঝিবেনঃ—

(১) "ভূপতি পূজিতে যে সকল চাই,
এ ভারতে আর সে সকল নাই!"
(২) "বারেক কুমার, চেয়ে দেখ ওই,
রাজদ্রোহী নয়, রাজভক্ত বই।"

আমরা পূর্ব্বে যে রাজভক্তির বাহ্য প্রদর্শনের কথা বলিয়াছি, তে তাহার কিঞ্চিৎ বাহুল্য দৃষ্ট হইল। দুই এক স্থান উদ্ধৃত লেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন ঃ—

"কুমার! তোমার আজি দরশন পাইয়ে,
তোমার মঙ্গলগান মন খুলে গাহিয়ে,
ভুলেছি যতেক দুঃখ, স্বর্গের কল্পিত সুখ
ভুলেছি, ভুলেছি সবি তোমা ধনে হেরিয়ে;
ভারতে আনন্দ-ধারা যায় আজি বহিয়ে।
(২) "কখনো দেখিনি যাহা,
আজি রে দেখিব তাহা;
সুভাগ্য এমন কার জগতে আছে?
শাস্ত্রীয় বিধান এই,
যে ভূপতি, বিভু সেই,
আজি ভাবী ভূপে হেরি,
হেরিব রে বিধাতায়।"
(৩) "ঈশ হে তোমার করুণা অপার;
তোমারি প্রসাদে ভারত মাঝার
হেরিনু কুমারে, এহ'তে আবার
কি সুখ জগতে দেখিতে পাই?" ইত্যাদি

রাজভক্তির এতদূর ছড়াছড়ির অভ্যন্তরে আমরা যেন কোন গূঢ় অভিসন্ধি দেখিতে পাইতেছি। গ্রন্থকার ত রাজকর্ম্মচারী নন। তবে

এরূপ স্তোত্রে তাঁহার কি অভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তবে কি পুরস্কার লাভেচ্ছা ইহার কারণ?

যুবরাজ সাহিত্যের মধ্যে ষষ্ঠ উল্লেখ-যোগ্য কাব্য শ্রীগোপালচন্দ্র দে প্রদত্ত রাজোপহার। এ খানির ললাট বা মলাটে এই কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ লিখিত আছে :—

(১) নিঃস্বার্থে পালয়ে প্রজা তারে বলি রাজা।
(২) ধরণী-ঈশ্বর নয় ধরার চাকর।
এই মনে ভাবে যেই সেই নরবর।
(৩) পক্ষপাতী নরপতি অভক্তি-আধার।

এই কয়েকটী বিষয়ের দিকে প্রত্যেক রাজার লক্ষ্য রাখা উচিত।

এতদ্ভিন্নও ইহাতে অনেক সত্য এবং অনেক সারগর্ভ উপদেশ লিখিত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সেই সকল সত্য এবং সেই সকল সারগর্ভ উপদেশ-রূপ উপকরণসামগ্রী একজন কবির হস্তে পতিত হয় নাই।

"যেমন পলাশ পুষ্প দেখিতে সুন্দর।
গন্ধ বিনা কেবা তার করে সমাদর॥"

সেইরূপ কবিত্ববিহীন কাব্যেরও আদর নাই। গ্রন্থকার এই সকল বিষয় গদ্যময় একটী ক্ষুদ্র রচনাকারে পরিণত করিলে ভাল করিতেন।

যুবরাজ-সাহিত্যের মধ্যে সপ্তম উল্লেখ-যোগ্য কাব্য—ভারতের সুখ-স্বপ্ন। এখানি নাটক। ইহাতে নাটকোচিত গুণ কিছুই নাই, তবে ভাষাটা নিতান্ত মন্দ নহে। গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের উপদেশ তিনি যেন এরূপ নাটক আর না লেখেন।

যুবরাজ-সাহিত্য হইতে আমরা যে সকল উদাহরণ তুলিলাম তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি ভারতবাসীদিগের অন্তর্নিগূহিত বিরাগের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত রহিয়াছে। যে গুলি স্তোত্রে পরিপূর্ণ, সে গুলিতে কেবল মৌখিক ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। কারণ আমাদিগের বিশ্বাস প্রকৃত ভক্তি বাহ্য-আড়ম্বর-শূন্য।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট— শুদ্ধ বলের উপর নির্ভর করিয়া ভারত শাসন করিতে চান তাহা লে কোন কথা নাই,—কিন্তু তাঁহারা যদি বুঝিয়া থাকেন যে প্রজা- গের অনুরাগ ব্যতীত শুদ্ধ বলে কখন অসংখ্য প্রজাকে অধিক দিন য়ত্ত রাখা সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে তাঁহারা আয়র্লণ্ডকে যে কল রাজনৈতিক স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ভারতের ধিবাসীদিগকেও সেই সকল স্বত্ব প্রদান করুন। ভারতবর্ষীয় প্রজারা ায়র্লণ্ডের অধিবাসীদিগের ন্যায় বলবান্, সাহসী ও অদম্য নয় লিয়া ইহাদিগকে এরূপ হীনাবস্থায় ফেলিয়া রাখা কি সভ্যাভিমানী ।টিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবর্ষীয় প্রজা- গকে স্বদেশীয় প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করিয়া াহাদিগের অনুরাগভাজন হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদিগের ার বিদেশীয় শত্রু হইতে এত ভয় পাইতে হইবে না। ব্রিটিশ গবর্ণ- ণ্ট ভারতের বিংশতি কোটী প্রজাকে অস্ত্র প্রদান করুন্। বিংশতি কাটি প্রজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বাপক্ষ্যে অস্ত্র ধারণ করিলে কাহার ধ্য ভারতে পদার্পণ করে? কিন্তু বিংশতি কোটী প্রজা নিরস্ত্র থাকিলে -বিংশতি কোটী প্রজা অস্ত্রবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিলে, এক লক্ষ সন্য লইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় অসংখ্য সেনার সহিত কত দিন দ্ধ করিতে পারেন? এক যুদ্ধে পরাজিত হইলে,—এক যুদ্ধে হতসর্ব্ব- সন্য হইলে—আর দ্বিতীয় যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন না! য়ত ইংলণ্ড হইতে রণে সুশিক্ষিত সৈনা আনার বিলম্ব সহিবে না! ভারতবর্ষীয় প্রজাবৃন্দকে অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত না করিলে আর ব্রিটিশ বর্ণমেণ্টের এরূপ আকস্মিক বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার আশা নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে স্বদেশীয় প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করিলে, তাহাদিগের হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কান ভয় নাই। কারণ তখন আর তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়া মনে করিবে না। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণ- মেণ্টের পক্ষ সমর্থন জন্য তখন তাহারা সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করি-

তেও পরাঙ্মুখ হইবে না। হিন্দুদিগের চিররূঢ় বিশ্বাস এই যে সমরে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। সেই চিরবদ্ধমূল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা মনের উল্লাসে সমরে প্রাণত্যাগ করিবে। এই জন্য আবার বলি—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে অচিরাৎ স্বত্ব ও শস্ত্র প্রদান করুন। ইহাতে তাঁহাদিগেরই পরিণামে মঙ্গল।

যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একথা বলেন যে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পূর্ব্বোক্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্তির এখনও উপযুক্ত হন নাই, তাহার প্রতিবাদে আমরা বলিব যে এ গুলি মনুষ্য মাত্রেরই জন্ম-স্বত্ব (Birth-right.)। সুতরাং তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার কাহারও অধিকার নাই। রাজ্য শাসনের জন্য যে গুলি অপরিহার্য্য, সেই গুলিই কেবল গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিতে পারেন।

আমাদের আরও একটী বক্তব্য আছে। যে ভারত এক দিন সমস্ত জগতের শৈশব-দোলা ছিল; যে ভারতের সন্ততিগণ এক সময় সুদূর পাশ্চাত্যে গমন পূর্ব্বক ইউরোপের অধিবাসীদিগকে ভাষা, ব্যবহার, নীতি, সাহিত্য এবং ধর্ম্ম পর্য্যন্তও শিক্ষা দিয়াছিলেন; যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যের শোণিত ইউরোপ, আমেরিকা, পারস্য, আরব এবং মিসর প্রভৃতি দেশের অসংখ্য অধিবাসীর শিরা-সমূহে অদ্যাপি প্রবাহিত হইতেছে;—সেই সকল জাতির গাত্রচর্ম্ম হিমানীসংসর্গে ধবলিতই হউক অথবা বিষুবস্সূর্য্যের প্রখর তাপে কৃষ্ণবর্ণ ই হইয়া যাউক, তাহাদিগের মুখকান্তিতে তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেই সেই আদিম জাতির ছাঁচ অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে; তাহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত সুসভ্য রাজ্য সকল একে একে ভূমির সহিত বিলীনই হউক, নব জাতি সেই ভস্মরাশি হইতে সমুদ্ভূতই হউক, প্রাচীন নগরী সকলের স্থানে নব নব নগরী সকলই সংস্থাপিত হউক, তথাপি সেই আদিম জাতির অঙ্ক কাল ও ধ্বংসের যুগপৎ আক্রমণেও বিলুপ্ত হয় নাই; সেই ভারত এবং সেই ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের সন্ততিগণ যে ইংরাজ জাতির সহিত সমান স্বত্ব ও অধিকার লাভের অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে ভারত হইতে পুরাকালের যাবতীয় ভাষায় ইডিয়ম্ ও ৷কৃতি প্রত্যয় সকল গৃহীত হইয়াছিল, সেই ভারতের সন্ততিগণ ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার উপভোগের অনুপযুক্ত—কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে সংস্কৃত ভাষার নব আলোচনা হেতু ইউরোপে গ্রীক ও লাটিন াষা অধিকতর বোধগম্য হইয়াছে, সেই সংস্কৃতের জননী ভারত-মির সন্ততিগণ ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার ভোগে নুপযুক্ত একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে সংস্কৃত ভাষা হইতে সমস্ত স্কাভনিক এবং জার্ম্মানিক ভাষা কল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সংস্কৃতের আবাসভূমি ভারতভূমির সন্ততি-ণ ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার ভোগের অনুপযুক্ত—কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে মনু—মৈসর, হিব্রু, গ্রীক, রোমীয় এবং অন্যান্য ইউরোপীয় াবহার শাস্ত্রের প্রাণদান করিয়াছেন, সেই লোকারাধ্য মনুর আবাস-মি ভারতের অধিবাসীরা ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধি-ার প্রাপ্তির অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে ভারতের দর্শনেতিবৃত্তকে সমস্ত জগতের দর্শনেতিবৃত্তের সং-ক্ষিপ্ত বিবরণ বলা যাইতে পারে, সেই ভারতের প্রজারা ইংলণ্ডীয় প্রজার সমান স্বত্ব ও অধিকার ভোগের অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

পাশ্চাত্য জাতিগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে যাইবার ময় যে ভারতের আচার ব্যবহার, ভাষা ও ধর্ম্ম—অধিক কি দেব-দবীর স্মৃতি পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সেই আর্য্যভূমি ভারত-ভূমির অধিবাসীরা ব্রিটনীয় প্রজার সমান স্বত্বও অধিকার ভোগের অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

যে ভারত সমস্ত প্রাচীন ও নবীন জাতির কবিত্ব ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় াথা ও সংস্কারের মূল; যে ভারত হইতেই জেরোষ্টারের উপাসনা-প্রণালী, মিসরের সঙ্কেতাবলী, অধিক কি খৃষ্টের উপদেশ-প্রণালী

পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল; সেই ভারতের অধিবাসীরা ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার ভোগের অনুপযুক্ত—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়!

মানবজাতির শৈশব-দোলা—সমস্ত সভ্য জাতির আদিম আবাসভূমি—ভারত! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। ইংলণ্ড! তুমি স্বাধীনতা-প্রিয়। সমস্ত জগতের দাসত্ব মোচন করা যখন তোমার চিরব্রত, তখন সমস্ত সভ্যজাতির জন্মভূমি ভারতভূমির দাসত্ব মোচন করিয়া সমস্ত সভ্যজগতে অতুল কীর্ত্তি লাভ কর, এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা! *

---

* ভারত ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বিষয়ে আমরা যাহা বলিলাম তাহা যে আমাদিগের কপোল-কল্পিত, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেন এরূপ মনে না করেন। ভারত ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক লিখিয়াছেন; আমরা এখানে কেবল সুবিখ্যাত ফরাসি গ্রন্থকার জ্যাকোলিয়েট্ যাহা বলিয়াছেন তাহারই ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :——

"India is the world's cradle; thence it is, that the common mother in sending forth her children even to the utmost West, has in unfading testimony of our origin bequeathed us the legacy of her language, her laws, her *morale*, her literature, and her religion.

Traversing Persia, Arabia, Egypt, and even forcing their way to the cold and cloudy north, far from the sunny soil of their birth; in vain they may forget their point of departure, their skin may remain brown, or become white from contact with snows of the West; of t[illegible] civilizations founded by them splendid kingdoms may f[illegible]d leave no trace behind but some few ruins of sculpture[illegible]lumns; new peoples may rise from the ashes of the first; new cities flourish on the site of the old; but time and ruin united fail to obliterate the everlegible stamp of origin.

Science now admits, as a truth needing no farther emonstration, that all the idioms of antiquity were deri- ed from the far East ; and thanks to the labours of Indian hilologists, our medern languages have there found their erivation and their roots.

It was but yesterday that the lamented Burnouf drew e attention of his class "to our much better comprehen on of the Greek and Latin, since we have commenced e study of Sanscrit."

nd do we not assign the same origin to Sclavnic and Ger- anice languages ?

Manou inspired Egyptian, Hebrew, Greek, and Ro an leigslation, and his spirit still permeates the whole conomy of our European laws.

Cousin has somewhere said, "The history of Indian ilososophy is the abridged history of the philosophy of le world"

But this is not all,

The emigrant tribes, together with their laws, their sages, their customs and their language, carreid with em equally their religion—their pious memories of the ods of that home which they were to see no more—of ose domestic gods whom they had burnt before leaving r ever.

So, in returning to the fountain-head, we do find in dia all the poëtic and religious traditions of ancient and odern peoples—The worship of Zoroaster, the symbols Egypt, the mysterics of Eleusis and the priestesse fas

Vesta, the Genesis and prophecies of the Bible, the *morale* of the Samian sage, and the sublime teaching of the philosopher of Bethlehem.

* * * * * *

Soil of Ancient India, cradle of humanity, hail! Hail, venerable and efficient nurse, whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! Hail, father land of faith, of love, of poetry and of science! May we hail a revival of thy past in our Western future!"

Jacoleiot's Bible in India.

সমাজচিন্তা।*

ইউরোপীয় এবং স্বদেশীয় সমাজের, তুলনায় সমালোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পূর্ণবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক--বিশেষতঃ আর্য্যদর্শনের একজন প্রধান প্রবন্ধরচয়িতা। এই জন্য আমরা ইতস্ততঃ করিয়া এতদিন এ পুস্তকের সমালোচনা করি নাই। তাঁহাকে প্রশংসা করিলে আত্মপ্রশংসাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইব, এবং নিন্দা করিলে প্রকৃত গুণের অনাদর-জনিত অপরাধে অপরাধী হইব, এই আশঙ্কায় এতদিন গ্রন্থখানি ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আর ফেলিয়া রাখা ভাল দেখায় না বলিয়া আজ আমরা ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

'স্বাধীনতা, সাম্য, ও প্রেম'—এই তিন মূলমন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া পূর্ণবাবু এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্বাধীনতা, সাম্য ও স্বজাতিপ্রেমই বর্ত্তমান ইউরোপীয় উন্নতির ভিত্তিভূমি, এবং তাহার অভাবই এসিয়ীয় অবনতির মূলীভূত কারণ। স্বাধীনতা ব্যতীত মানব-প্রকৃতির ও মানব-সমাজের পূর্ণবিকাশ অসম্ভব। ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে সেই স্বাধীনতার লোপ হওয়ায়, এখানকার মানবপ্রকৃতি ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পূর্ণবাবু ইউরোপীয় সভ্যতার বৃহৎ দৃশ্যপটের অভ্যন্তরে এই স্বাধীনতা দেবীকে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের মধ্যে জাজ্বল্যমান দেখিয়া ও তদ্বিরহে এসিয়ীয় সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন--যে স্বাধীনতা ব্যতীত মানবসমাজ ও মানবপ্রকৃতির পূর্ণস্ফোটন সম্ভবপর নহে। এই মতের সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

কিন্তু তিনি গ্রন্থারম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার সহিত এ সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য নাই। তিনি লিখিয়াছেন 'শত শত বর্ষ ধরিয়া ইংরাজগণ রাজত্ব করুন, ভারতে তাঁহাদিগের রাজত্ব প্রোথিত হউক, এই

* শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

আহাদিগের আন্তরিক বাসনা, এই আমাদিগের প্রার্থনা।' যদি স্বাধীনতার অভাবেই এ দেশের এই দুর্গতি, তবে কোন্ প্রাণে—কোন্ সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি চিরদিন স্বদেশকে সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে প্রস্তুত হইলেন ?

পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন যে 'ইংলণ্ড আজি ভারতের শিক্ষাগুরু- * * *- ইংরাজগণ হইতে আমরা এই চারিটী প্রধান ও নূতন ভাব লাভ করিয়াছি। (১) ঐহিক সুখের প্রতি অনুরাগ। (২) স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ। (৩) স্বদেশের প্রতি অনুরাগ। (৪) স্বজাতির প্রতি অনুরাগ।'

প্রাচীন আর্য্যেরা ঐহিক সুখের প্রতি অনাদর শিক্ষা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের লক্ষ্য স্বতন্ত্র ছিল। 'অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ'—তাঁহারা ঐহিক সুখভোগ করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়িতেন না। বস্তুতঃ ঐহিক সুখে পূর্ণাসক্তি, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সবিশেষ অন্তরায়। ঐহিক সুখে পূর্ণাসক্তি থাকিতে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা হইতে পারে না। নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা ব্যতীতও মানবপ্রকৃতির পূর্ণ উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে না। স্বাধীনতার প্রতি যাঁহার অনুরাগ, তিনি সামান্য ভোগ সুখের অধীন হইতে পারেন না। যাঁহার সুখ বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ, তিনিই প্রকৃত স্বাধীন ও প্রকৃত সুখী। এই জন্যই ভারতীয় ঋষিবৃন্দেরা 'অনাস্থা বাহ্যবস্তুষু' এই নীতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বহির্জগৎ অপেক্ষা অন্তর্জগতের উপর রাজত্ব করা অধিকতর শ্লাঘাকর বলিয়া মনে করিতেন। বস্তুতঃ যিনি অন্তর্জগতের অধীশ্বর—ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপর যাঁহার পূর্ণ ঈশিত্ব—তাঁহার নিকট সমস্ত বহির্জগতের অধীশ্বরত্ব তুচ্ছ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। এ কঠোর যোগসাধনা কয় জনের ভাগ্যে ঘটিতে পারে ? ভারতীয় আর্য্যেরা জাতিসাধারণের জন্য এ কঠোর সাধনা ব্যবস্থা করেন নাই। জাতিসাধারণকে ঐহিক সুখের অনুসরণে নিরস্ত থাকিতে বলিয়া, কতিপয় নেতার জন্যই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আজও ভারতীয় হিন্দুজাতিসাধারণ ঐহিক সুখের

অনুসরণে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত। তবে 'আমরা ঐহিক সুখের প্রতি অনুরাগ ইংলণ্ড হইতে শিক্ষা করিলাম' এ কথা কিরূপে সত্য হইতেপারে ?

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ ভারতীয় আর্য্যেরা যেরূপ জানিতেন এরূপ পৃথিবীর আর কোন জাতি জানিতেন কি না সন্দেহ। স্বজাতি-প্রেম না থাকিলে কতিপয়মাত্র আর্য্যপুরুষ কখন এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। একটী আর্য্যের কেশ স্পর্শ করিলে তখন সমস্ত আর্য্য-হৃদয় বাজিয়া উঠিত। সে দিন এখন গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে নীতি ভারতবক্ষে খোদিত রহিয়াছে। যাহার চক্ষু আছে, সেই সে পড়িতে পারিবে—তাহা শিখিতে বৈদেশিকের শরণাপন্ন হইতে হইবে না।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—যে জাতি একদিন এই গান গাইয়াছিলেন, সেই আর্য্যজাতির সন্ততিগণকে স্বদেশানুরাগ শিখিতে ইংরাজের শরণাপন্ন হইতে হইবে—ইহাও আশ্চর্য্যের কথা। তবে এ বিষয়ে ইংরাজের নিকট আমরা কোন শিক্ষা পাই নাই, এ কথাও বলিতে পারি না কারণ প্রাচীন আর্য্যেরা অধুনাতন বিশ্ব-জনীন ভৌগোলিক স্বদেশানুরাগ জানিতেন কি না সন্দেহ। তাঁহা-দিগের স্বদেশানুরাগ স্বজাতিপ্রেমের সহিত এরূপ জড়িত ছিল, যে দুইটীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহারা ভাবিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ইংরাজ যেমন ইংলণ্ডবাসি-মাত্রকেই ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করেন, ভারতীয় আর্য্য সেইভাবে ভারতীয় অধিবাসিমাত্রকেই আলিঙ্গন করিতে পারিতেন না। 'ইংরাজ শব্দ শুনিলে' ইংরাজের মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, 'ভারতবাসী' এই শব্দ শুনিলে ভারতীয় আর্য্যের অন্তরে সে সুখোদয় হইত কি না সন্দেহ। তাঁহার জাতিভেদ এই বিশ্বজনীন ভৌগোলিক স্বদেশানুরাগের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। এই ভৌগোলিক স্বদেশানুরাগের নাম পেট্রিয়টিজম্। ইংরাজ যে এই পেট্রিয়টিজম্ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। আরও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে ইংরাজ আমাদিগকে স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ শিক্ষা দিয়াছেন। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের

বলবতী ইচ্ছা ইংরাজের নিকটই আমরা শিক্ষা করিয়াছি। ইংরাজ ভারতে না আসিলে সমস্ত ভারতবাসীকে এক সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত করার প্রসঙ্গও উঠিত কি না সন্দেহ।

ভারতীয় আর্য্যেরা ব্যক্তিগত পূর্ণবিকাশ লইয়া যত ব্যস্ত ছিলেন, জাতীয় পূর্ণবিকাশের জন্য ততদূর ব্যাকুল ছিলেন না। ঋষিগণ প্রত্যেকে আদর্শ পুরুষ হইতে চেষ্টা করিতেন, অনেকে সেই চেষ্টায় দেবত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জাতীয় দেবত্ব স্থাপনের দিকে তাঁহাদিগের ততদূর চেষ্টা ছিল না। পূর্ণ যোগীর আদর্শ ভারতে ভিন্ন আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই উতুঙ্গ আদর্শ পুরুষের সহিত ভারতের নিম্নতম অধিবাসীর আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল। ভারতের সমতল ক্ষেত্র হইতে হিমাচলের উচ্চতম শৃঙ্গরাজি যেরূপ দূরবর্ত্তী, সেই মহাপুরুষগণ হইতে ভারতের নিম্নতম শ্রেণী তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দূরবর্ত্তী। কালের গতিতে এই দূরত্ব আপনিই কমিতেছিল, ইংরাজ আসিয়া তাহা আরও কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের মঙ্গল সাধন করা ইংরাজের অভিপ্রায় কিনা জানি না, তবে ইংরাজ ইহা দ্বারা যে ভারতের ভাবী মঙ্গলের সূত্রপাত করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরস্পর দূরত্ব যত কমিবে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ ততই বদ্ধমূল হইবে। আমরা বলিনা যে যাঁহারা উচ্চে আছেন, তাঁহাদিগকে নামাইয়া নিম্নশ্রেণীর সহিত সমতল করিতে হইবে। চৈতন্য তাহা করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা যে সাম্যবাদের পক্ষপাতী—সে সাম্যবাদ ছোটকে বড় করিয়া লইয়া সমতল করিতে চাহে, বড়কে ছোট করিতে চাহে না। এই সাম্যবাদ—যে ছোট তাহার উঠিবার পথে কণ্টক রোপণ না করিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দেয়।

আমাদের বর্ত্তমান অবনতির একটী প্রধান কারণ ভারতবাসিগণের বৈদেশিকগণের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ। বৈদেশিকগণের সহিত সংঘর্ষ ব্যতীত স্বদেশানুরাগ স্ফূর্ত্তি পায় না। প্রতিযোগিতা ব্যতীত পরের উৎকর্ষ দেখিয়া নিজের উৎকর্ষ সাধন করা যায় না।

প্রাচীন আর্য্যেরা আত্মগরিমায় এতদূর অভিভূত হইয়াছিলেন, যে ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশে যাওয়া তাঁহারা আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহারা আত্মোৎকর্ষের এত আদর করিতেন যে পরোৎকর্ষের সহিত তাহার তুলনা করা, এবং তুলনা করিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করা আবশ্যক বোধ করিতেন না। এক সময়ে ইহাতে মহৎ ফল ফলিয়াছিল। যখন সমস্ত পৃথিবী অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন জ্ঞানালোকে ভারত জগৎকে ঝলসিত করিয়াছিলেন। মৌলিকতায় তখন ভারত জগতের শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। আত্মোৎকর্ষে তখন ভারত এত মহীয়ান্ হইয়াছিলেন, যে অপর দেশের সহিত তুলনা করিয়া ভারতের কোন উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভারতীয় নিরপেক্ষ উন্নতি যখন চরম সীমায় উপনীত হইল, তখনই এই নিরপেক্ষতাজনিত বিপৎপাত উপস্থিত হইল। উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আপেক্ষিক মাত্র। তুলনা ব্যতীত ইহার মূল্য স্থির হয় না। তুলনা ব্যতীত কিছুই উৎকৃষ্ট নহে, কিছুই অপকৃষ্ট নহে। জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলেরই মূল্য তুলনায়। যখন ভারতের বহিশ্চর রাজ্য সকল অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিলেন, তখনও ভারত আত্মোৎকর্ষ-গরিমায় অভিভূত হইয়া রহিলেন। ভারতের বাহিরে গিয়া দেখিলেন না যে কোন্ বিষয়ে কোন্ দেশ তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। শুদ্ধ যে তখন দেখিলেন না এরূপ নহে, ভবিষ্যতে আর কেহ যে দেখিবে সে পথেও কণ্টক রোপণ করিয়া গেলেন। সিন্ধুর অপর পারে গমন বা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। ইহার বিষময় ফল আমরা পুরুষ-পরম্পরায় আজও ভোগ করিতেছি। এক্ষণে সেই নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা জ্ঞান বা অর্থ উপার্জ্জনে দেশ দেশান্তরে গমন করিতেছেন, আমরা সেই পুরাকালীন নিষেধের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগকে সবিশেষ নির্যাতন করিতেছি। অধিক কি কোন বিজ্ঞ সম্পাদক বিদেশপ্রত্যাগত যুবকমণ্ডলীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে ঘোল ঢালিতে আদেশ দিতেও লজ্জিত নহেন। উৎকর্ষের

চরম সীমায় আরূঢ় প্রাচীন আর্য্যেরা যে আত্ম গরিমায় অন্ধ হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু অধমাধম আধুনিক হিন্দুজাতির অভিমান কেন জানি না! যখন ভারতীয় আর্য্যেরা অন্যান্য দেশবাসিগণ অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তখন তাঁহারা অপরকে ম্লেচ্ছ বলিয়া যে ঘৃণা করিতেন তাহা সাজিত। কিন্তু এক্ষণে যাঁহাদিগের অধীনে রহিয়াছেন, যাঁহাদিগকে দেবভাবে নিত্য পূজা করিতেছেন তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাদিগের দেশে যাহারা পদার্পণ করিবে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত অগ্রহণীয় মনে করা বাতুলতা মাত্র। যাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া মানিতেছেন, তাঁহাদিগের দেশে যাওয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না! ধন্য আমাদের শিক্ষা! ধন্য আমাদের আত্মাভিমান!

ইউরোপীয় স্বদেশানুরাগ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ইহা আত্মাভিমানে অভিভূত হইয়া পরদ্রব্য স্পর্শ করা, পরদেশ গমন করা, পরের বস্তু ভোগ করা প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ বলিয়া মনে করে না। তাই ইউরোপের আজ এত উন্নতি। যেখানে যে জিনিস উঠিল, ইউরোপীয় দেশ সকল ত্বরিত গতিতে তাহার অনুকরণে আপন দেশে তদনুরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। অনুকরণ কেন করিব, কেন ছোট হইব এ অভিমান ইউরোপীয় ও আমেরিকা জাতিনিচয়ের মধ্যে নাই। তাই যে দেশে যে যে বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, অচিরকাল মধ্যেই সেই সেই বিষয় আমেরিকা ও ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে। পরস্পরের উন্নতিতে পরস্পর মহীয়ান হইয়া উঠিতেছে। এই জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকা সভ্যতায় ও বলবত্তায় জগতে অতুলনীয়। কিন্তু হিন্দুজাতির সে পূর্ব্ব সৌভাগ্য নাই, সেই অতীত সৌভাগ্যজনিত অভিমান রহিয়াছে। বিষধরের বিষ গিয়াছে, কেবল গর্জ্জন অবশিষ্ট আছে।

যতদিন আমাদের এই অভিমান না যাইতেছে, ততদিন আমাদের জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই। যাহার উত্থানশক্তি নাই,

সে—যে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে দেখিয়া হিংসা করে। সেইরূপ আমরা উত্থানশক্তিহীন বলিয়া যে সকল ইউরোপীয় জাতি উদ্যোগশীল, তাহাদিগের সমান হইবার যে চেষ্টা করে আমরা তাহারও হিংসা করিয়া থাকি; এবং সামাজিক নির্যাতন দ্বারা সেই হিংসা প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপে আমরা পদে পদে ভবিষ্য উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিয়া থাকি। জানি না কত দিনে আমরা এ রোগ হইতে মুক্ত হইব। জানি না কতদিনে আমরা বৃথা-অভিমানমুক্ত হইয়া প্রকৃত গুণের অনুকরণে রত হইব। মধুকরেরা যেমন নানাস্থান হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্রকে বিভূষিত করে; যত দিন না আমরা সেই মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নানা দেশ হইতে গুণরাশি ও রত্নরাজি আহরণ করিয়া স্বদেশকে বিভূষিত করিতেছি, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই! জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই।

আমাদের অবনতির আর একটি প্রধান কারণ উপলব্ধি হয়—পারিবারিক ও সামাজিক অধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতার ফল ইহা অনেকে বুঝিয়াও বুঝেন না। যাহারা পারিবারিক ও সামাজিক অধীনতায় জড়ীভূত, তাহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেও রক্ষা করিতে অক্ষম। যাহারা পরিবার ও সমাজ মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বা কার্য্য করিতে অক্ষম; তাহারা অধিকতর অমূল্য, অধিকতর কষ্টলভ্য, ও কষ্টরক্ষ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবে কিরূপে? 'আমি অমুক কার্য্য ভাল বলিয়া জানি, কিন্তু করিতে পারি না; কারণ গৃহে বৃদ্ধা প্রপিতামহী বর্ত্তমান; অথবা অমুক জ্ঞাতি তাহা হইলে আমার অন্ন গ্রহণ করিবে না'—যাঁহারা এই গার্হস্থ নীতি দ্বারা সঞ্চালিত, তাঁহারা কেমন করিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবন আহুতি দিবেন? যতদিন সামান্য সামান্য বিষয়ে আত্মোৎসর্গ অভ্যস্ত না হইবে, ততদিন সেই প্রাণোৎসর্গলভ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার আশা কোথায়? অঙ্কুর না হইতে বৃক্ষের উৎপত্তির আশা কোথায়? রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্রমশঃ পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানত্রয়—(১) সামাজিক

স্বাধীনতা, (২) পারিবারিক স্বাধীনতা ও (৩) ব্যক্তিগত স্বাধীনত
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বাধীনতা-ভাবের ক্রমোন্নতির সর্ব্বপ্রথম সোপান
যাহার নিজের ইচ্ছাশক্তির উপর প্রভুতা নাই, সে-পরের ইচ্ছাশ
দ্বারা নিশ্চয়ই সঞ্চালিত হইবে। যে নিজে পরাধীন সে রাজনৈতি
স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা হইবে কিরূপে। অতএব যদি তুমি রা
নৈতিক স্বাধীনতার প্রবর্ত্তয়িতা হইতে চাও, তবে অগ্রে দেখাও
তুমি নিজে পরের ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা সঞ্চালিত নও; দেখাও যে তু
যাহা নিজে ভাল বুঝ, সহস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাহা তুমি কা
পরিণত কর; দেখাও যে তোমার ইচ্ছা ও কার্য্যের মধ্যে কেহ
অন্তরায় হইতে পারে না, দেখাও যে তুমি কর্ত্তব্যানলে নিজে
জীবনকে আহুতি দিতে সক্ষম। এইরূপ যে পরিবার ও যে সমাজ আ
ইচ্ছা-শক্তির উপর পূর্ণ প্রভুতা লাভ করিয়াছে, সেই পরিবার ও সে
সমাজই রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রবর্ত্তনে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি,
পরিবার, বা যে সমাজ এই আত্ম-শক্তিসম্পন্ন হয় নাই, তাহা দ্বারা
দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। কার্য্য ও চিন্তার সামঞ্জস্য ব্যতী
জাতীয় উন্নতি হয় না। বিচারশক্তি-বলে কোন্‌টী কর্ত্তব্য কোন্‌
অকর্ত্তব্য জানিতে পারিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। তোমার জীব
দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে দেখাইতে হইবে যে তুমি যাহা কর্ত্তব্য বলি
প্রচার কর, তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাসও কর। যাহা কর্ত্তব্য বলি
তুমি প্রচার কর, যদি তুমি তাহা কার্য্যে না দেখাও, লোকে তোমা
কথার শ্রদ্ধা করিবে না। তোমাকে প্রতারক বলিয়া মনে করিবে
আমাদের দেশে অধুনা এই রোগ বিশ্বজনীন হইয়া পড়িয়াছে। সক
লেই উপদেশ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু উপদেশপালনে কেহই প্রস্তুত নহে
আমাদের দেশে বাক্যবীরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কি
কার্য্যবীর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখে সহস্র সহস্র ম্যাট্‌সি
ও গ্যারিবল্‌ডী পাওয়া যাইবে, কিন্তু কার্য্যে এক জন মিলিবে না
বাক্যে অসংখ্য সমাজসংস্কারক মিলিবে, কিন্তু কার্য্যে কেহই অগ্র
হইবে না। কিন্তু শুষ্ক কথায় আর মন ভিজে না। আমরা এক

কার্য্য চাই। বাল্যকাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্যকাল উপস্থিত হইয়াছে। কার্য্য বিনা জাতীয় জীবন স্ফূরিত হয় না। কার্য্য বৈদেশিকের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা নহে, ব্যক্তিগত ও সমবেত চেষ্টা দ্বারা অন্তর্জাতীয় উন্নতিসাধন। আভ্যন্তরীণ উন্নতি হইলে, অনুগ্রহ ভিক্ষার আবশ্যকতা হইবে না।

স্বাবলম্বন ব্যতীত জাতীয় উন্নতি হয় না। যে পরের লাঙ্গুল ধরিয়া স্বর্গে উঠিতে চেষ্টা করে, সে মূঢ় ও জগতের ঘৃণার পাত্র। যখন বৈদেশিকগণ আমাদিগকে জ্ঞানী বা ধনী করিয়া দিবে, তখনই আমরা জ্ঞানী বা ধনী হইব—এই বলিয়া যে জাতি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, সে জাতির উন্নতির আশা কোন কালেই নাই। শিশুকে ক্রমাগত ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইলে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কখনই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয় না। তাহাকে হামাগুড়ি দিয়া ক্রমে বেড়াইতে শিখিতে হইবে। হাবুডুবু না খাইলে কেহ কখন সন্তরণ শিখে না। যে চিরকাল পরের পৃষ্ঠে চড়িয়া সন্তরণ শিখিতে চেষ্টা করে, তাহার আর সন্তরণ শিখা ঘটে না। রাজনৈতিক সাগরে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে সমাজতরঙ্গিণীতে সন্তরণ শিখিয়া লও। ইংরাজগণ সন্তরণ শিখাইতেছে না বলিয়া দুঃখ করিও না। যাহা তাহার স্বার্থের বিরোধী, সে তাহা করিবে কেন? তুমি হাবুডুবু খাইয়াও নিজে সন্তরণ শিখিবার চেষ্টা কর; ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। পূর্ব্বোক্ত যে সকল মহাসত্য আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, পূর্ণবাবুর পুস্তকে তাহা বিস্তৃতরূপে অন্যপ্রকারে বর্ণিত আছে। যাঁহারা বন্ধুর তিরস্কার-বাক্যে বিরক্ত হন, তাঁহারাই এই পুস্তক পাঠে অসন্তুষ্ট হইবেন। জ্ঞানী লোকে গম্ভীরভাবে ইহা পাঠ করিবেন। যে যে গুণে ইউরোপ আজ এত অভ্যুদয়শালী; পূর্ণবাবু আমাদিগকে সেই সেই গুণের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যাহার চৈতন্য আছে, সে ইহাতে কর্ণপাত করিবে। যে চৈতন্যশূন্য হইয়াছে, তাহার এ চিৎকারে কোন উত্তেজনা হইবে না। তাহার উপর ভারতের ভাবী আশা ন্যস্ত নহে। যাহাদিগের জীবনীশক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা ভারতের সঞ্জীবন-কার্য্যের

উপাদান-সামগ্রী হইতে পারিবে না। যাহাদিগের জীবনীশক্তি কিঞ্চিৎ আছে, তাহাদিগকেই পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

পূর্ণবাবু ভারতের সঞ্জীবন-কার্য্যোপযোগী যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধান—স্বদেশানুরাগ, স্বাধীনতানুরাগ, স্বাবলম্বন, ও আত্মোৎসর্গ। এই কয়টী গুণে ইউরোপ ও আমেরিকা আজ স্বর্গপুরী। ইহার অভাবে আজ ভারত নিশ্চেষ্ট, নির্ম্মম ও স্বার্থান্ধ আজ ভারতবাসী জাতীয় সুখে ও জাতীয় জীবনে উদাসীন হইয়া নিজের সুখ ও পারিবারিক সুখ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। তাঁহার সমস্ত দেশ, সমস্ত জগৎ, নিজের পরিবার। পারিবারিক জীবনেই আত্মোৎসর্গের সূত্রপাত হয় সত্য, কারণ মহাজন বলিয়া গিয়াছেন 'Charity begins at home' গৃহেই বদান্যতা প্রথম আরম্ভ হয়, গৃহেই লোকে প্রথম আত্ম ভুলিতে অভ্যাস করে। কিন্তু যাহার আত্মোৎসর্গ সে সঙ্কীর্ণ সীমায় চিরদিন আবদ্ধ থাকে, সে কখন পূর্ণ মানব হইতে পারে না। এই আত্মোৎসর্গ পরিবার হইতে স্বদেশে, স্বদেশ হইতে মানবজগতে, মানবজগৎ হইতে প্রাণিজগতে, প্রাণিজগৎ হইতে শেষে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয় জগৎ পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়। যিনি সেই উচ্চতম সোপানে উঠিতে চান, তাহাকে ক্রমশঃ পর পর ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা এক্ষণে প্রথম ক্রমে আছি, আমাদিগকে আপাততঃ দ্বিতীয় ক্রমে উঠিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যেমন আত্ম ভুলিয়া পরিবারগতপ্রাণ হইয়াছি, সেইরূপ পরিবারগতপ্রাণ এই অবস্থা হইতে স্বদেশগতপ্রাণ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। এ সাধনা সহজ সাধনা নয়, যে যোগী ইহাতে সিদ্ধ হইবেন, তিনিই ধন্য! সে স্বদেশ—বঙ্গদেশ কি ভারত—যাহার জীবনের যেরূপ লক্ষ্য সে সেইরূপ ভাবিতে পারে। তাহা অতীতসাক্ষী ইতিহাসে পরীক্ষিত হইয়াছে যে বাঙ্গালা স্বতন্ত্র ভাবে কখন দাঁড়াইতে পারে নাই; কখন যে দাঁড়াইতে পারিবে তাহারও আশা দেখিনা। প্রকৃতি ভারতকে আসিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে এরূপ বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে, যে ভারত একটী সমগ্র দেশ ভিন্ন আর কিছু

হইতে পারে না। অন্যান্য দেশ ভারতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। সুতরাং আমরা ভারতকে স্বদেশ বলিয়া মনে করি, এবং বঙ্গদেশকে সেই দেশের অঙ্গ বলিয়া এত ভালবাসি। এত ভালবাসি বলিয়াই ইহাকে অঙ্গীভূত ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করি না। অঙ্গীকে ছাড়িয়া অঙ্গ কখন পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা সেই অঙ্গীভূত ভারত হইতে অঙ্গভূত বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে আমরা আত্মঘাতী বলিয়া মনে করি। তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই। আমরা ভারত উদ্দেশে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিব।

পূর্ণবাবু উপসংহারে নারীজাতির দুরবস্থা বিষয়ে অতি সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা অতীত ও বর্ত্তমান ভারত নামক প্রবন্ধে নারীজাতিব সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছি, পূর্ণবাবুর তাহার প্রতিধ্বনি দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। পূর্ণবাবুর ন্যায় আমাদেরও বিশ্বাস যে স্বাধীনতা ব্যতীত কি পুরুষ কি স্ত্রী কাহারই শারীরিক, মানসিক, ও হৃদগতবৃত্তি নিচয়ের পূর্ণ পরিপাক অসম্ভব। যে কালে আর্য্যললনা বিদ্যা-বুদ্ধি ও সতীত্বাদিগুণে জগতের আদর্শরূপিণী ছিলেন, তখন ভারতে অনেক পরিমাণে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল। গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিয়া—নিরন্তর দূষিত বায়ু সেবন করিয়া—অন্তঃপুরের বহিস্থ জগতের সহিত সম্বন্ধ-বিরহিত হইয়া আধুনিক ভারতললনা যেরূপ রুগ্নদেহ, ভগ্নমন ও সঙ্কীর্ণ-হৃদয় হইয়া যাইতেছেন। তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ নিতান্ত নৈরাশ্যময় বলিয়া বোধ হইতেছে। ভারতের অর্দ্ধেক বা তদধিক অধিবাসী এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত থাকিতে ভারতের আর কি আশা! কিন্তু যত দিন ভারতের পুরুষ স্ত্রী জাতির প্রতি যথোচিত সম্মান করিতে না শিখিতেছেন, ততদিন স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্ভাবনা কোথায়? স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

অভিনয় সমালোচনা।

কাব্যের সারভাগ দৃশ্যকাব্য। সংসার-নাট্যশালার নট নটী প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ চিত্রের প্রতিকৃতি নাটক। সুখে দুঃখে, ও ইন্দ্রিয়বিশেষের উত্তেজনায় মানবপ্রকৃতি যে বিবিধ আকৃতি ধারণ করে, নাটক তাহারই প্রতিবিম্বন। যে শিল্প প্রকৃত জীবনের ফটোগ্রাফ্‌কে প্রকৃত জীবন বলিযা দর্শকমণ্ডলীর নিকট বিভ্রম উৎপাদন করে, তাহাই অভিনয়। যে পরিমাণে সেই অভিলষিত বিভ্রম উৎপাদিত হয়, সেই পরিমাণেই অভিনয়ের কৃতকার্য্যতা। যে শিল্প নকলকে আসল বলিয়া বিভ্রম উৎপাদন করিতে সমর্থ, নকল তোলা অপেক্ষা তাহার আদর্শ দেখিয়া গৌরব নিতান্ত ন্যূন নহে। তবে মানবজীবন-চিত্রকরের সহিত অভিনেতার প্রভেদ এই যে—চিত্রকর আপন নায়ক নায়িকা ও পাত্র পাত্রীগণকে ইচ্ছানুরূপ চিত্রিত করেন; মানবজাতি সুলভ গুণ বা দোষ লইয়া আপন আপন ইচ্ছামত তাহাদিগকে অলঙ্কৃত বা কলঙ্কিত করেন; তাঁহার নায়ক নায়িকা বা পাত্র পাত্রী কোন নির্দ্দিষ্ট পুরুষ বা কোন নির্দ্দিষ্ট রমণীর ছবি না হইতেও পারে;—কিন্তু অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে সেই কবিচিত্রিত চিত্রের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে হয়। আর একটী প্রভেদ এই যে মানবজীবন-চিত্রকর কবি একা অসংখ্য চরিত্রের চিত্রন করিয়া থাকেন; তাঁহাকে এক সময়েই রাজা, প্রজা, যুবা বৃদ্ধ, যুবতী, বৃদ্ধা, চোর, সাধু, উদাত্ত, অনুদাত্ত, শত্রু, মিত্র, প্রভৃতি অসংখ্য অসমভাবাপন্ন চরিত্রনিচয়ের হৃদয়সাগরের অধস্তম প্রদেশে নামিয়া তথাকার এক একটী ক্ষুদ্র কাঁকরও দেখাইতে হয়; কিন্তু অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কার্য্য প্রত্যেকে এক একটী চরিত্রবিশেষে আসলের বিভ্রম উৎপাদন করা। যাহা হউক কবি-দৃষ্টি নাটক অপেক্ষা অভিনয় কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও,—নাটকের উপকারিতা সম্পাদন ও নাটকের মূল ও ভাবের উপলব্ধিবিষয়ে, অভিনয়ের উপযোগিতা অধিক